তৃতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর

নাটকের মতো লোকনাটকেও কাহিনির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-সংলাপ প্রভৃতি উপাদানগুলি এই কাহিনি বা বিষয়ের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে, কোন কাহিনি বা ঘটনা গল্প বা উপন্যাস পড়ে পাঠক যতটা অনুভব করতে পারে, তার চাইতে মঞ্চে বা আসরে অভিনয়-গীত ও সংলাপের মাধ্যমে সেটি রসাস্বাদন করতে পারলেই সেই ঘটনার অভিঘাত দর্শক মনকে বেশি নাড়া দেয়। সেদিক থেকে লোকনাটকের কাহিনির প্রাধান্য এখানেই। কিন্তু কিছু কিছু লোকনাটকে খণ্ড খণ্ড কোন কাহিনি বা ঘটনা তুলে ধরা হয়। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাযুক্ত লোকনাটকগুলিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাটকের পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করতে চাননি। তাঁর মতে, "গম্ভীরার গান সাময়িক ঘটনার পর্যালোচনা মাত্র, কিন্তু কোন আনুপূর্বিক ঘটনা (Theme) নিয়ে তা রচিত নয়। একমাত্র এই কারণেই তাকে লোকনাটকে অঙ্গীভূত করা যায় না।

আলকাপের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে তাই।... সুতরাং উপস্থাপনার মধ্যে লোকনাট্যের গুণ থাকা সত্ত্বেও তা-ও লোকনাট্য নয়।"[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি কেবল খন, পালাটিয়া এবং রঙ্ পাঁচালকেই একসময় গ্রামীণ লোকনাট্য হিসেবে গণ্য করেছিলেন।' তবে 'আনুপূর্বিক' কোনো কাহিনি থাকলেই তা লোকনাট্যের পর্যায়ে পড়বে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ উত্তরবঙ্গের এমন অনেক লোকনাটক আছে, যাতে আনুপূর্বিক কোন ঘটনা নেই। তা কেবল বিচ্ছিন্ন কাহিনি বা ঘটনার সমাহার। এ প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মিত্র যথার্থই বলেছেন, "...আদ্যান্ত কাহিনী না থাকলে নাটক (Drama) না হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ লোকনাটক হতে বাধা 'লোক' সমাজে হয় না। ঐসব পালার কোনো কোনোটায় খণ্ড-জীবনচিত্র বা সাময়িক ঘটনার খণ্ড-কাহিনী বর্ণিত হলেও সর্বস্তরের 'লোক'সাধারণ তার মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে থাকে।"[২] অর্থাৎ লোকনাটকের কাহিনির সার্থকতা জনমনোরঞ্জনের উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল।

লোকনাট্যের উদ্ভব সূত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, গুহাবাসী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনা, আবেগ-উত্তেজনা প্রভৃতি ইশারা বা অস্ফুট ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল। এরপর বেঁচে থাকার তাগিদে শিকারে সাফল্য লাভের আশায় এক অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নত করার মধ্যে এবং তাকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে শুরু হল রিচ্যুয়াল। বাস্তবে যা রয়েছে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা থেকে জন্ম হল অনুকরণমূলক নানা অভিনয়। তাই প্রথমদিকে রিচ্যুয়াল-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই প্রকাশ পায় নৃত্য-গীত-অভিনয়। এ ধরণের যাদু অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লোকনাট্য সৃষ্টির প্রাক্‌মুহূর্ত থেকেই ধর্মীয় প্রভাবে বিকশিত

হয়ে আসছে। লোকনাটকের প্রাথমিক পর্যায়ের দিকে যদি আমরা ফিরে যাই তবে দেখব, বিভিন্ন যাদু ধর্মীয় আচার-আচরণ যেমন— ব্রত, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতীতির অস্তিত্ব। তাই আদিতে লোকনাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছিল পুরাণ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদের ভাষায়, "মূলত পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই যেহেতু পাঁচালি গাওয়া হতো এবং 'মঙ্গল' গান গাওয়ার আসরেও উপজীব্য গল্পগুলি দেবমহিমাজ্ঞাপক হবার ফলে, তারাও আধা-পৌরাণিক অথবা, 'লোক পৌরাণিক' চরিত্রেরই ছিল, ফলে প্রথম আমলে লোকনাট্যধারাগুলিও প্রায় ব্যতিক্রমবিহীন ভাবেই ছিল পুরাণবৃত্তান্ত-নির্ভর।"[৩] আর এক্ষেত্রে সেইসব কাহিনিকেই বেছে নেওয়া হত, যেগুলির মধ্যে ভাব গভীরতা থাকে এবং যার মাধ্যমে দর্শক ও শ্রোতার মনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষা হয়। তবে এসব পুরাণ-মঙ্গলকাব্য নির্ভর লোকনাটকগুলি কোনদিনই ধর্মীয় আবেগসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। বলা যায় এতে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব কখনও স্থান পায়নি। উল্টে দেখা যায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এ সমস্ত বিনোদনে যোগ দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। তেমনি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় হিন্দুর পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও বহুকাল ধরে অভিনয়ে নিযুক্ত রয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে পৌরাণিক লোকনাটকগুলিতে পরিবর্তনের ছাপ তেমন পড়ে না। এই ধরণের মন্তব্য করেছেন লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, "বিষয়বস্তু তার মধ্যে অবিচল থাকে, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ তার মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে, এবং কাহিনীও তার অগ্রগতির ধারায় নতুন কোন পথ সন্ধান করে নিতে পারে না, একই পথে চলতে থাকে, তার ফলে তার মধ্যে ক্রমে প্রাণশক্তি লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।"[৪] এখানে উল্লেখ্য বিষয়বস্তু এর মধ্যে অপরিবর্তিত রইলেও কালের নিয়মে মানুষের চিন্তা-চেতনার সাথে সাথে এসব পৌরাণিক কাহিনির মধ্যেও বর্তমান নানা সামাজিক প্রসঙ্গ প্রবেশ করছে। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েই সাধারণের সুখ-দুঃখ ফুটে ওঠে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় অভিনয় চলাকালীন চরিত্রগুলির মধ্যে সামাজিক চেতনা জেগে ওঠে অর্থাৎ সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যায়। আর তখনই পৌরাণিক বিষয়কে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দিকগুলি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত মন্তব্য, "হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রী-পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।"[৫] তবে যে কথা তিনি ছড়ায় পৌরাণিক বিষয় বা চরিত্রের উপস্থিতি ও রূপান্তরের সম্পর্কে বলেছিলেন, তা লোকনাটকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এরপর ধীরে ধীরে পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি সামাজিক কাহিনি স্থান পায় লোকনাটকে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির বদল অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই পুরাণ বা মঙ্গ লকাব্যের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য লোকনাটকের বিষয় হিসেবে উঠে আসে সমাজ। তবে পৌরাণিক লোকনাটকগুলি এক্ষেত্রে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। এখনও স্বমহিমায় গ্রামাঞ্চলে এগুলি টিকে রয়েছে। পৌরাণিক পালাগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে যে বিষয়গুলি অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সামাজিক জীবন প্রভৃতি তুলে ধরা সম্ভব হত না, তা নতুন করে রূপ পেল সমাজবিষয় নির্ভর লোকনাটকগুলিতে। কারণ "পৌরাণিক পালার মাধ্যমে নীতিবোধ, ন্যায়বিচার, ধর্মবুদ্ধি ইত্যাদি শেখানোর একটা ব্যাপার থাকে যদিও, তবু তার মধ্যেও সামাজিক অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সূক্ষ্মভাবে প্রতিবাদ সূচিত হয়। আর যখন সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে পালা রচিত হয়, তখন প্রতিবাদটা অনেক স্পষ্ট এবং সরাসরিভাবেই ব্যক্ত হয়।"[৬] অর্থাৎ এসব বিষয় বা কাহিনির মধ্যে জনসাধারণ নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। কাহিনি ও চরিত্রের সাথে তারা একাত্মতা অনুভব করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক বিষয় হিসেবে স্থান পায় অবৈধ প্রণয়, অসামাজিক কুৎসা প্রভৃতি। এ ধরণের লোকনাটকের কাহিনি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "নাটকের বিষয়বস্তু গ্রামজীবনভিত্তিক; সেই বৎসর [পুরানো কোনো দিনের কথা নয়] সেই গ্রামে যেসব প্রণয়মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়, নাট্যকাহিনীতে সঙ্গীতে সংলাপে নৃত্যে তারই রূপায়ণ দেখা যায়।...কাহিনীগুলো গ্রাম্য নরনারীর একান্ত প্রেমের অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বিশেষত সে প্রেমের কাহিনী সত্য হয়েও যদি অবৈধ কিংবা অস্বাভাবিক হয় তবে তা আর বেশি উত্তেজনা এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করে।"[৭] তাই পালাটিয়া, চোর-চুন্নি, গম্ভীরা, খন, আলকাপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজকে কেন্দ্র করে সামাজিক-বিষয়, যেমন- দাম্পত্য কলহ, কুৎসা প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল।

বর্তমানে এসব ধারাতে বেশ কিছুটা রূপান্তর এসেছে। শুধু সামাজিক বিষয় নয়, রাজনৈতিক ঘটনাও স্থান পেয়েছে লোকনাটকের বিষয় হিসেবে। কখনও কখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার কাজে আসরে নেমেছে লোকনাটকের দলগুলি। একসময় এই লোকনাটকগুলি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সমাজের বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হত। কিন্তু এখন তা কেবল ইতিহাস মাত্র। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে পড়ে এগুলি ক্রমশ প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে। সংবাদ পরিবেশনে লোকনাটকের ভূমিকা অনন্য, তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রভৃতি এক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। উৎস থেকে আজ পর্যন্ত লোকনাটকগুলি অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে এসেছে। তাই অনিবার্যভাবে এগুলির মধ্যে এসেছে নানা রূপান্তর। এই রূপান্তর মূলত দু'ভাবে হয়ে চলেছে— ক) কালিক, খ) স্থানিক। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকনাটকগুলিতে যে রূপান্তর দেখা যাচ্ছে, তা কালিক বা কালগত রূপান্তর। সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা যেমন— সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এর মূল উপজীব্য। আবার লোকনাটকগুলিতে স্থানগত যে রূপান্তর লক্ষ করা যায় তা স্থানিক বা স্থানগত রূপান্তর।

এক্ষেত্রে স্থানভেদে একই সময়ে একই ধরণের লোকনাটকের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকনাটকগুলিতে যে ধরণের রূপান্তর ঘটে চলেছে তার মধ্যে অন্যতম কাহিনিগত রূপান্তর। স্থান-কাল ভেদে লোকনাটকগুলির কাহিনি বিবর্তনের ধারায় যেভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে, তা সত্যিই লক্ষণীয়। আলোচনার সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি যেমন— মালদহের 'গম্ভীরা', উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খন', দার্জিলিং-এর 'নটুয়া', জলপাইগুড়ির 'পালাটিয়া' এবং কোচবিহারের 'কুশান' লোকনাটকে কাহিনিগত যে রূপান্তর ঘটে চলেছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল—

গম্ভীরা ঃ

চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজন বা লৌকিক সূর্যোৎসবকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এখন বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পূর্বে গম্ভীরা উৎসবে মূলতঃ দুটি অঙ্গ লক্ষ করা যেত— ক) পূজা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, খ) বোলবাই বা গীতাভিনয়। পূজা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পড়ে ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাসা, ফুলভাঙা, মশান নাচ, সামশোল ছাড়া, ঢেঁকিমঙ্গল এবং আহারা পূজার ব্রত পালন, মন্ত্র প্রভৃতি। অন্যদিকে বোলবাই বা গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হত আহারা পূজার দিন। তবে 'ঘটভরা' অনুষ্ঠানের দিনটি ছাড়া বাকি দিনগুলিতে পূজা, ব্রত পালনের পাশাপাশি নাচগান প্রভৃতি পরিবেশিত হত।

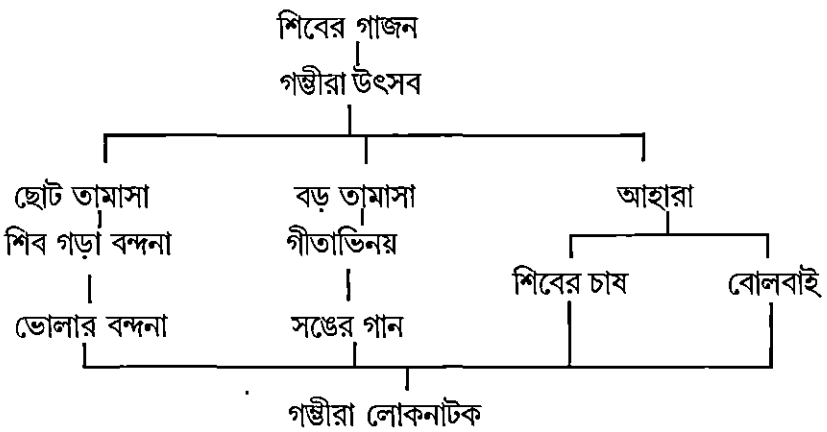

ছোট তামসার দিন শিব গড়া বন্দনা পাঠ করা হত বলে জানা যায়। এই সময় ভক্তদের কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হত। এই প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত বলেছেন, "আরতির পূর্ব্বে বন্দনা পাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়।"[৮] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এর মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত গম্ভীরার বীজ নিহিত ছিল। শিব গড়া বন্দনায় মূলত স্থান পেত সৃষ্টিতত্ত্ব। যেমন—

নমঃ শিবায়

(১)

"সৃষ্টি জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।
কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যাকার।।
কাঁকড়া সূতযোনি হেমের আকার।
কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা আনিবার।।
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ।
সেই ডিম্ব হইল দুইখান।।
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান।
শিবনাথ কি মহেশ।"[৯]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সৃষ্টি পুরাণের মিথকথা 'পৃথিবী সিজ্জন'- এর মতো টেল (Tale) উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে প্রচলিত আছে।

কিন্তু পরবর্তীতে শিব বন্দনায় ক্রমশ শিব-নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি স্থান দখল করে। যেমন—

"এই বুড়াটা দেবের হাটে, ভৃগুমুনির যজ্ঞপাটে
করিয়া যক্ষ রক্ষ সব স্বাপেক্ষ,
(সেখানে) দক্ষ রাজার মানটি কাটে।।
দাসে অভয় দিতে, শিবগাদিতে
বুড়া কখনো পাহাড়ে উঠে (ভাই রে)
সেখানে জুটিয্যা মাতাল,
পাহাড়্যা সাঁতাল
বেতাল গানের ঠাটেরে
কখনো শ্মশান ঘাটে লিচ্ছে হুদ্‌রা,
বিছানা, মরার গুদরি গুদরা,
এমনি খ্যাদরা ছি ছি রে।
বসে ফাঁকায় ভাঙ্গের বিচিরে।
এই বুড়া চাকলা ঠাকুর গোবর্দ্ধনে,
(ভাই) লোকের নাশিতে পাপটা,
কাশীতে বসে হাসির ছটায় দামিনী ছুটে।।"[১০]

আবার যে শিবকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা উৎসব হয়, তাঁকে আসরে উপস্থাপিত করে এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করেই এক সময় শিব বন্দনা গাওয়া হল। ভক্তগণ শিবকে 'নানা', 'ভোলা' প্রভৃতি নামে ডেকে প্রতীকী সেই মহাশক্তির কাছে তাদের সমস্ত অভাব, অভিযোগ, সমাজের অন্যায় অবিচার ইত্যাদি তুলে ধরেন প্রতিকারের জন্য। শিব গড়া বন্দনা থেকে এই যে ভোলার বন্দনায় রূপান্তরের পথ চলা, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. ফণী পাল বলেছেন, "জনরুচি ও চাহিদার চাপে শিববন্দনা রূপান্তরিত হয়ে তা ভোলার বন্দনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। গম্ভীরায় শিববন্দনা ও ভোলার বন্দনা বস্তুত একই বৈশিষ্ট্যের সংগীত। তবে সময়ের পরিবর্তনে তাদের বিষয়, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে কিছু কিছু ভিন্নতা এসেছে। প্রাচীনকালের ভোলার বন্দনা ভাবের যে গাম্ভীর্য, চিন্তার গভীরতা, ভাষার পারিপাট্য ও দেবাদিদেব শিব-চরিত্রের যে গাম্ভীর্য বজায় থাকত ভোলার বন্দনায় সে গাম্ভীর্য থাকেনি। মহাদেব স্বয়ং ভোলানানা হয়ে তাঁর শাস্ত্রীয় আঁটোসাঁটো খোলস খুলে ফেলেছেন। দেবত্বের দূরত্বকে দূরে সরিয়ে নিত্য দিনের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। গম্ভীরার লোকশিল্পীরা ভোলামহেশ্বরকে ভোলানানায় (দাদু) নামিয়ে এনে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছেন।"[১১]

বড় তামাসার দিন অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও যে সমস্ত নৃত্য-গীত-হত, তার মধ্যে রঙ্গ-তামাসা ছিল অন্যতম অঙ্গ। এই দিন অনুষ্ঠিত গীতাভিনয় সম্পর্কে হরিদাস পালিত বলেছেন, " বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র অথবা পৃথক পৃথক, স্ত্রী-পুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি, চারিয়াড়ি, ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।"[১২] দুপুরবেলা গম্ভীরা-মণ্ডপ থেকে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঢাক সহ নৃত্য করতে করতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করত ভক্তগণ। আবার কোথাও কোথাও বড় তামাসার দিন সঙের গান বের করার রীতিও প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "সারা বছরের কোনো বিশেষ খবর, কোনো অন্যায় বা দুর্নীতির প্রতিবাদ এই সঙের গানের মাধ্যমে প্রচার করা হত। সঙের গানে পালাবদ্ধ কাহিনি থাকে না। ছোট ছোট স্তবকে রচিত সংবাদগুলো মূল গায়েন গেয়ে শোনাতেন। সহায়তা করতেন দোহারের দল। দলে দু'একজন 'ছোকরা' ও 'বিদূষক'ও থাকতেন। বাজনা থাকত অল্প। গম্ভীরায় গম্ভীরায় যেমন নির্দিষ্ট দিনে মুখা নাচ হত তেমনি বড়ো রাস্তার প্রধান প্রধান মোড়ে বা এলাকার বড়ো বড়ো বাড়িতে সঙের গান হত।"[১৩] তবে সঙের গান এখন অনুষ্ঠিত না হলেও এর পরিবর্তিত রূপ গম্ভীরার চার-ইয়ারী ও ডুয়েট সঙ্গীতে লক্ষ করা যায়।

আবার আহারার দিন সকালে কোনো কোনো অঞ্চলে 'শিবের চাষ' বলে একটি রিচ্যুয়াল প্রচলিত ছিল। এতে কৃষিকাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মগুলি মোড়লসহ ভক্তেরা নৃত্য-গীত-বাদ্য-সংলাপ সহ সমবেতভাবে অভিনয় করত। এছাড়া বোলবাই নামে পালাধর্মী যে অনুষ্ঠান আহারার দিন অনুষ্ঠিত হত, তাতে সারা বছরে সংগঠিত কোন বিশেষ ঘটনা অথবা গান-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে এ ধরনের কাজকর্মের নিরপেক্ষ

প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করত বোলবাই গান। বোলবাই গানের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিদাস পালিত বলেছেন, "এই দিবস দুই তিন ব্যক্তির সম্মিলনে যে গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র। ...যে বিষয় লইয়া গান আরম্ভ বা রচিত হয়, তাহাকে উক্ত গীতের 'মুদ্দা' বলে। প্রত্যেক গানের 'মুদ্দা' থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অবলম্বনে একটি গীত রচিত হইল। অতএব এই গানের 'মুদ্দা' ভূমিকম্প। কোন 'খলিফা' অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট 'মুদ্দা' বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীত রচনা করিয়া দেন। যে গীতের মুদ্দা স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচনা হইলে লোকেরা স্ত্রী-পুরুষাদির বেশে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশের অভিনয় করে।"[১৪] এই বোলবাহি গান তৎকালীন সময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বোলবাই গানের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরা হত সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নর-নারীর অবৈধ প্রণয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দোষীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করত বোলবাই গান। কিন্তু কেচ্ছামূলক এই পালাগুলির রচয়িতা ও অভিযুক্ত ব্যক্তিটির মধ্যে ক্রমশ বিরোধ দেখা যায়। এমনকি কোন কোন সময় তা আদালতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই এই ধরণের কেচ্ছামূলক ঘটনাগুলি গান থেকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতায় পরিবর্তন আনা হল। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ শহরের পাশাপাশি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গ্রামীণ শিল্পীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এই সময় "শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক অ-নৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কভিত্তিক আদিরসাত্মক পালাগান পরিবেশনার মধ্যেই বোলবাহি পালার বিষয়বস্তুর পরিধি সীমিত রইল না। বোলবাহির পুরোনো বিষয়বস্তুর ওপর নতুন চিন্তা ভাবনার অভিঘাত দেখা গেল। সচেতন দর্শক পৃষ্ঠপোষক পালাকার গীতিকার গায়ক অভিনেতার সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন নতুন বিষয় ও আঙ্গিকের অনুশীলন শুরু হল।"[১৫] স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও দেখা যায় স্থানীয় ঘটনার পাশাপাশি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গম্ভীরা গানে স্থান করে নিয়েছে।

ড. প্রদ্যোত ঘোষকে অনুসরণ করে গম্ভীরা পালার বিষয়বস্তুর বিবর্তনকে কিছুটা সংযোজন করে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে—

সাল	← ১৯০০	১৯০১-১৯২০	১৯২১-১৯৪৭	১৯৪৮-১৯৬০	১৯৬১-১৯৮০	১৯৮১-২০০০	২০০১→
বিষয়	স্থানীয় খবর বা রিপোর্ট (কৃষি জন-জীবন বিষয়ক)	আধ্যাত্মিক বিষয়ক	আধ্যাত্মিক পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রচারধর্মী বিষয়ক

সমসাময়িক বিষয়কে নিয়ে গম্ভীরা পালা রচিত হয় বলে প্রতিবছরই গম্ভীরার কাহিনি বিবর্তিত হয়। গম্ভীরার বিষয়বস্তুর এই বিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক আর্য্য চৌধুরী বলেছেন, "আদিকাল থেকেই গম্ভীরা গান বা বোলাই প্রতিবছর নতুন করে রচনা করা হয়। গম্ভীরা গান পালা কোনো একটানা একই বিষয়বস্তুকে ধরে হয় না। ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো নানান ধরনের ঘটনাকে নিয়ে গান বাঁধা হয় আর তার সঙ্গে থাকে সংলাপ, অভিনয় , নাচ ও হাস্যরস ইত্যাদি।"[১৬] গম্ভীরা গানের প্রাচীনতম কিছু নিদর্শনে আধ্যাত্মিক বিষয় লক্ষ করা গেলেও মূলত সমাজজীবনই বারবার উঠে এসেছে। প্রথমদিকে স্থানীয় খবর, পারিবারিক কুৎসা প্রভৃতি পালাগানে প্রাধান্য পেত। গম্ভীরা গানকে এই ব্যক্তিগত কুৎসা, দলাদলির ক্ষেত্র থেকে বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতির জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার পথিকৃৎ ছিলেন দু'জন গম্ভীরা শিল্পী মোহম্মদ সূফী ও সেখ সোলেমান। বলা যেতে পারে তাঁরাই প্রথম গম্ভীরার কাহিনিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "আদিতে সমাজের বা গ্রামের কোনো ব্যক্তিবিশেষের [প্রভাবশালী ব্যক্তিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য] ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হত। কারণ, সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেত। দূরবর্তী কোনো ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু গানে জায়গা করে নেয়। এ- ধারার প্রবর্তক উক্ত মুসলিম রচয়িতাগণ। কারণ, হিন্দুর ধর্মীয় চৌহদ্দীর বাইরে তাঁদের যেতে অসুবিধে হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এর প্রবর্তনে তাঁদের সুবিধে হয়েছিল।"[১৭] উল্লেখ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে পট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মনেও দেশের পরিস্থিতি, সমাজ ও রাজনীতি ভিন্ন মাত্রা নিয়ে সামনে আসে। ফলে পরাধীন ভারতে ইংরেজদের অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন সমস্ত কিছুই গম্ভীরায় স্থান পায়। ইংরেজদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গম্ভীরার কবি-শিল্পীরা। যেমন— ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গম্ভীরা শিল্পী মোহম্মদ সূফী কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।[১৮] তেমনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সেইসময় গম্ভীরার বহু পালার অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বহু শিল্পীকে গ্রেপ্তার করাও হয়েছিল। যদিও "স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোথাও এঁদের নাম লেখা হয়নি, কিন্তু এঁদের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে, দেশের শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের গান ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখে নি। ১৯৪৪-৪৫ সালে মালদহের তাৎকালিক ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. এ. বার্ণওয়েল কবি গোবিন্দলাল শেঠ, মটরবাবুকে গ্রেপ্তারও করেন। মোহম্মদ সোলেমানও তাঁর এজলাসে কৈফিয়ৎ দিয়ে আসতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবী জেলাশাসক সি. এস. কাল্‌হন সে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন।

শুধু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে নয়, স্বাধীনোত্তর যুগেও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গান করায় মটর, নিরু ও গোপীনাথের দল আক্রান্ত হয়েছে।"[১৯] অর্থাৎ এসবের মধ্য দিয়েই গম্ভীরা শিল্পীদের গণকবি

ও শিল্পী পরিচয় পাওয়া যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে স্বাধীনোত্তর যুগে শিল্পীরা নিরপেক্ষভাবে পালা রচনা করতে পারে নি। সেক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে। যাই হোক, বর্তমানে গম্ভীরা পালায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রশাসনের ভুল-ত্রুটিগুলিকে ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সচেতনামূলক কাজকর্মের প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। দেশ-বিদেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, পরিবার কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি গম্ভীরার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছে গম্ভীরার কবি শিল্পীরা। ফলে স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে গম্ভীরার কাহিনি হয়ে চলেছে রূপান্তরিত। কয়েকটি গম্ভীরার পালাগুলি আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন—

"তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর,
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।
লয়ে মদন রতির লাঙ্গল ঈশ, চাষ জুড়েছো জগদীশ
(তুমি) বিষম বেগে বিপুল বিশ্ব ঘুরাও নিরন্তর।
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণু কুমার বীজ-বুনানি মজুর তোমার
কতই না বীজ হয় না সুমার ওহে গঙ্গাধর।
তুমি বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভুগাও বিষ্ণু দ্বারা ফসল ফলাও
নিজে বসে ঠুম্‌রু তালে ডুম্‌রু বাজাও ঝম্‌রুতে গান ধরো।
মন আত্মা দুই বলদ বেঁধে, কর্ম জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়া রুজ্জু নাশায় ছেদে কতই না আর তাড়।"

এই গানটি মূলত আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। ভারতীয় সভ্যতায় শিবকে কৃষিদেবতা রূপে অনুমান করা হয়। তিনি চাষীরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চাষ করে চলছেন অর্থাৎ চালাচ্ছেন। দুই বলদরূপ মন ও আত্মাকে বেঁধে সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেছেন। সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলিকে এই মায়ার সংসারে প্রতিনিয়ত উস্কে দেন। সৃষ্টি থেকে ধ্বংস সবকিছুকেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তবু এ সংসার দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কবির প্রার্থনা এই জগৎ সংসারকে রক্ষার দায়িত্বও যেন তিনিই নেন।

মোহম্মদ সূফী রহমান রচিত এই গানটিতে বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—

"চাচা জান বাঁচা দায় হলো বানে শহর যায় ভায়স্যা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগ্‌ছে দুয়ারে বইস্যা।।
ক্ষীরোদ সাহা, মহেন্দ্র শেঠে বাঁধলো বান বালুরঘাটে।
বাঁধ ভ্যাঙ্গ্যা ঢুকল বান, একজিবিশানের মাঠে।
মাঠে হুক্কা ভাসে; দেখে পোস্টমাষ্টার হাসে।।"

বন্যার কবল থেকে বড় বড় উকিল, মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার কেউই বাদ যায়নি। সেই সময় বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্ষীরোদ সাহা ও মহেন্দ্র শেঠ নামে দুজন ব্যক্তি নিজেদের খরচায় বালুচরে বাঁধ বেঁধেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বাঁধ ভেঙে 'একজিবিশানের' মাঠে বন্যা ঢুকে পড়ে। এই ঘটনাই পালাকারেরা গম্ভীরা গানের রিপোর্টে পরিবেশন করেন।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চারদিক থেকে বহিঃশত্রুর আক্রমণে যখন বিপর্যস্ত প্রায়, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের দুর্দিনের কথা তুলে ধরা হয়েছে গম্ভীরা গানে। যেমন—

"ভারতবাসী মোরা প্রজা তোরা রক্ষাকর্তা
যেমন পুত্রে রক্ষা করাই তাহার মাতা পিতা
(তোদের) গেল কোথায় পরাক্রম রক্ষা করতে অক্ষম
(সাহেব) আমরা হলে মুখ দেখাতে পারতাম না।
চিরকাল দুঃখে কষ্টে দেহ জর্জরিত
পরাধীন ভারতবাসী মোরা হায় কেঁদেছি নিয়ত
অবিচারের যূপকাষ্ঠের প্রাণ দিয়েছি কত কষ্টে
(সাহেব) তার ফল কি তোরা ভোগ করবি না।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপর্যয়ের জন্য তাদের নিজেদের সীমাহীন লোভ, অহংকার, অনাচার-অবিচারকেই দায়ি করা হয়েছে। এই গানটিতে ইংরেজদের বিদ্রুপ করে পরাধীন ভারতবাসীর আনুগত্যের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

"খাদ্যের অভাব পড়েছে বাংলায় শুন পশুপতি
সেন্ট্রাল থেকে আনছে খাদ্য ঘুঁচাতে দুর্গতি। (শিব হে)
বাঁচাতে লোকের জীবন, সরকার করেছে রেশন
অনশনে মরবে না কেউ বাংলার।।
... ...
পাশ হচ্ছে হিন্দু কোড বিল আইন মজাদারী
ভাই বোনে সমান অংশ পাবে তাড়াতাড়ি। (শিব হে)
বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বলে স্বামী যাবে রসাতলে,
নারীরাই সুখ পাবে স্বাধীনতার।। (দেশে)
জমিদারী গেল আইনে জোতদারীও যাবে,
পাঁছাত্তরে কেমন বল তারা দিন কাটাবে। (শিব হে)"

এই সালতামামিটিতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। বাংলায় চরম খাদ্যসংকট। খাদ্যাভাব দূর করার জন্য কেন্দ্র থেকে খাদ্য সরবরাহ এবং রেশন প্রক্রিয়া চালু অন্যতম পদক্ষেপ। স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্রিটিশ আইন পরিবর্তনের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে কংগ্রেস সরকার। সেইসময় হিন্দু কোড বিল আইন প্রণয়ন হয়। এই আইনানুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাই-বোন সমান অংশীদারী লাভ করে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন চালু হওয়ার সাথে সাথে নারীরা স্বাধীনতার সুখ ভোগ করে। জমিদারী প্রথা উঠে যায়, জোতদারী প্রথাও যাওয়ার পথে।

"হায়রে সখের সিনেমা, তোর অপার মহিমা,
এমন মনের খোরাক দেখে লাগে তাক
কি দিব তার তুলনা।।
(পায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিতুই ভজে যে জনা)
বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতা ছবিতে কহিছে কথা
অবাক চোখে সবাই দেখে উত্তম সুচিত্রা।
... ...
হায়রে সিনেমার নেশা সবাইকে করলে বে-দিশা
যুবক যুবতী কাঁচা পোয়াতি সবার ঐ দশা
বুড়া বুড়ি পুরুষ নারী কচি বাচ্চার দল ছাড়ে না।।
... ...
জ্ঞানী জন ভরেন জ্ঞান ভাণ্ডার অবুঝে শিখে ব্যাভিচার
হাঁসের মতন জুটে ক'জন বেছে নিতে দুধের সাত
দাস উপেন বলে করম ফলে বুক চাপড়ায় অন্ধ কানা।।"

এই গানটিতে সমাজজীবনে সিনেমার প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য ক্ষমতায় ছবি কথা বলে, তা দেখে সকলের চোখে লাগে ধাঁধা। সিনেমার নেশা যুবক-যুবতী, পোয়াতি, বুড়া-বুড়ি, নারী-পুরুষ, কচি-বাচ্চা কাউকেই ছাড়ে না। সিনেমা সভ্যতা আমাদের রুচি সংস্কৃতি সমস্তই ব্যাপকভাবে গ্রাস করছে। তবে সিনেমা দেখার মধ্যে সুফল-কুফল দুটোই আছে। প্রকৃত জ্ঞানীরা তা থেকে জ্ঞান আহরণ করেন, আবার অবুঝ লোকেরা তা থেকে শেখে ব্যাভিচার। কিন্তু এ ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তি আর ক'জনাই বা থাকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিনেমার কুফলই মাথা চারা দিয়ে ওঠে।

"১. রাশিয়ার অস্ত্র পাঞ্জাবে চালান সরকারী পাহারাতে
খালিস্থানীরা করছে ধ্বংস সেই অস্ত্রাঘাতে

শিশু নারী যুবা অগণন শিখে হাতে হচ্ছে নিধন
সরকার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে দিনে দিনে হত্যা বাড়ছে
পুলিশ পাহারায় ভাষণ বিলায় অপদার্থ সিদ্ধার্থশঙ্কর।

২. মোদের পুলিশের মত পুলিশ আছে কি কোন দেশে
হত্যা লুণ্ঠন দমন পীড়ন পরিণত অভ্যাসে
বিহার, আসাম, উড়িষ্যা জুড়ে লক আপেতে পিঠিয়ে মারে
মানুষের চক্ষু উৎপাটন, দলবদ্ধ হয়ে নারী ধর্ষণ
মোদের মন্ত্রীগণ চালায় শাসন এই পুলিশেই করে নির্ভর।

৩. গণতন্ত্র নয় দলতন্ত্র চলছে এই ভারতে
খুনী গুণ্ডা লম্পট চিটার ঢুকছে সব দলেতে
দাদাদের মদতের জোরে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ঘুরে
দলের নির্বাচনের তরী বাহিতে এরাই যে কাণ্ডারী
ব্যস্ত বিলাস ব্যসনে প্রমোদ ভ্রমণে ভারতের মন্ত্রীপ্রবর।"

গানটিতে দেখি সমসাময়িক পরিস্থিতিতে রাশিয়ার মদতে পাঞ্জাবে অস্ত্র পাচার মুসলিম ও শিখের দাঙ্গাকে আরও উস্কে দিয়েছিল। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য প্রান্তেও খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ বাড়তে থাকে। সেই সময় আমাদের দেশের মন্ত্রী ও পুলিশের অকমর্ণতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। ভারত গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। খুনি, গুণ্ডা, লম্পট, চিটাররাই দলের নির্বাচনের কাণ্ডারী। অন্যদিকে মন্ত্রীরা কেবল বিলাসব্যাসনে প্রমোদ ভ্রমণে ব্যস্ত।

"শুন হে মিনিষ্টার
দ্যাশে বাড়াইস না আর,
ঘিনাহা সংস্কৃতির আবর্জনা
(কইরছে) বিদেশী কোম্পানী
করছে কাপরা টানাটানি।
খুইল্যা লেওয়ার আগে ফুর্তি করহে মানা।
... ...
সেন্সার বোর্ডের বুদ্ধির গুণে
তোর দপ্তরের আইন-কানুনে,
সুস্থ মানুষের মাথায়

কইরছে ছ্যানা

চলে দূরদর্শনে রোজ নামচা

বসে দেখি চোখে ব্যাইন্যা গামছা।"

এই গানটিতে দেশে যে অপসংস্কৃতির চর্চা চলছে তার বিরুদ্ধে ক্রমশ জমে থাকা ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী কোম্পানীর অর্থ সাহায্যে চলছে আমাদের দেশের তথ্যসংস্কৃতি। তাই সবকিছু জেনেশুনেও নীরব ভূমিকা পালন করতে হয় দেশের মানুষকে। সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্রে বিকৃত রুচিগুলিকেই চোখ বুজে মেনে নিতে হচ্ছে। এছাড়া বিজ্ঞাপনও নারীদেহ প্রদর্শনে রমরমা কারবার করছে। এর ফলে যুবক থেকে বৃদ্ধ এই বিকৃত রুচির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সুস্থ সংস্কৃতি চিন্তার অবসর পায় না মানুষ।

গানটিতে দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাবার আশায় নানা শিবের শরণাপন্ন হয়েছেন। যেমন—

"আরে ঘুষখোর সমিতি সংগঠন আজ ভারতে জোরদার

ঐ পুলিশ ডাক্তার অফিসার মাস্টার (শিব হে)

এই সমিতির মেম্বার হে

মোটা টাকা ডোনেশন দিলে বিদ্যালয়ে সিট মেলে

ও ঘুষ ছাড়া হাসপাতালে রক্ত মিলবে নাকো ভাই হে।

আরে বাহাতের মন্ত্র রে আর ব্যাঙ্ক থেকে ব্লাডও রে

এই জনসেবার নামে করে গরীব শোষণ

(শয়তানরা) এই জনসেবার নামে করে গরীব শোষণ।"

৫৭ বছরের স্বাধীন ভারতে ঘুষখোর সমিতি-সংগঠনগুলি ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল প্রায় সব জায়গায় ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। শিক্ষায়তনগুলিতে ডোনেশনের নামে মোটা টাকা ঘুষ নেওয়া হয়। হাসপাতালগুলিতে চলে ঘুষের রমরমা কারবার। সেখানে জনসেবার নাম করে চলে গরীব শোষণ।

খন ঃ

খন লোকনাটক অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাসে অথবা যে কোন অবসর সময়ে অভিনীত হলেও পূর্বে কিছু কিছু অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন খন পালা অভিনয় হত। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের দেশি-পলি-রাজবংশী সমাজে দুর্গাবলী গান তথা নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "... 'খনগান' হচ্ছে উৎসবের গান, উৎসবকালের গান, অবসর-অবকাশ বা বিরামকালের গান; মালদহের গাজোল থানায় এই গানকে 'খোজাগরি', 'খজাগরি', 'কোজাগরি', খন গান বলা হয়। কোজাগরী-পূর্ণিমায়

লক্ষ্মী পূজার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মেলার আয়োজন থাকে বা 'মেলা বসে'; বেশ কিছুকাল আগে, এই উৎসবের সময় 'খন' গান অনুষ্ঠিত হত।"[২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে দেবী লক্ষ্মী প্রতিটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে জাগ্রত লোককে আশীর্বাদ করে যায়। তাই এই রাতে সকলের জেগে থাকার রীতি রয়েছে। কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রি জাগরণের সময় মানুষ উৎসব আনন্দে মেতে উঠে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। সেই অনুষ্ঠানই হয়তো ধীরে ধীরে পালাধর্মী অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল। খন গানের আদিরূপ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অখণ্ড দিনাজপুর জেলায় বোলোভাই, লবকুশ, গোষ্ঠ, খোশোমামি-ডেবরা, লগ্‌নি প্রভৃতি লোকগান একসময় বহুল প্রচলিত ছিল। যদিও এখন তা বিলুপ্তপ্রায়। এগুলির মধ্য দিয়েই খনগান পরিপুষ্টি লাভ করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ এই গানগুলিতে বিষয়রূপে নির্বাচন করা হত পারিবারিক-সামাজিক সমস্যা সংঘাত, অভাব-অনটন, নরনারীর প্রেম প্রভৃতি বিষয়। একটি বোলোভাই গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হল—

"পাথ্‌রাজ নদীর আইচ্চে বে
কান্তাই বেচা নাও
বোগ্‌-বগিয়া দাড়িয়া ফেলাইচে
লাম্বা লাম্বা পাও
তাক্‌ দেখিয়া চমকিচে তাজিমের মাও
আলুয়া তাংকু
তুষের আগুন মজা লাগাইচে
তাজিমের মাও পাটংগাত পাইচে।"[২১]

গানটি হাস্যরসপ্রধান হলেও এর মধ্যে স্বর্ণকার ও কর্মকারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া দিনাজপুরের অন্যতম প্রাচীন লগ্‌নি গানেও দেখা যায় নর-নারীর প্রাকৃত প্রেমের ছবি।

"চালের টুহিত্‌ ঘুঘুর গে বাসা
মোর পিরতি জ্বালাভাসা গে নাগরি
নাগরি হাসিয়া মন্‌ মোর পাগলা লো
ওরে আটার বন্ধু পাটা গে বাড়ি
দুরের বন্ধু আশা ধারী গে নাগরী
নাগরী হাসিয়া মন মোর পগ্‌লালো
ওরে হাওদা দেখে হাতি কান্দে-রে মাহুত
সাজে কান্দেরে ঘোড়া

এমন সাধের হাতি কিনম রে

আসাম দেশে রে যাইয়া"[২২]

তবে এই গানগুলি থেকে সরাসরি খন গানের উৎপত্তি হয়নি। দিনাজপুর জেলায় হুলির গান, নটুয়া, চোকচুন্দি প্রভৃতি গানও প্রচলিত ছিল। যেমন, নটুয়া গানে—

"একদিন মালু দুদিন মালু

মারিয়া মারিয়া নতুর পালু

হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া না ফেলালু

আণ্ডির দশা মোকে কলু

এ হে রে হে শ্রীমতি হাসি হাসি লুঠ করেছে বারে

ঘুরাই ফিরাই লাগত বারে

একদিন দুদিন মালু

এ হে রে হে গমর গমর চাল মাইট

গমর গমর চাল

মাঝ হাটত যাই

হাত খপ ফের কেটাই

ধমশ করি বসে

আধখান ঢুকিলে মাইট কেকের মেকের করে

গটায় ঢুকিলে মাইট ফেকেত করি হাসে।

এ হে রে হে মোক মালু ভালয় কলু

ভাঙিলু হাতের শাঁখা

ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেক গোলামের বেটা

কাহাক নাগিল টাকা।"

সংগ্রহসূত্র ঃ খুশী সরকার, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর।

আবার 'চোকচুন্দি' গানেও দেখা যায়—

"হায় হায়—

চিংরিট মারে জাংগুয়া কাখর

আসিয়াট করে লটর গে পটর

চিংরিট মারিল কইনার হুরারে

আসিয়ার ভাঙ্গিলু কুশিয়ার খুয়া দাত

হায় হায় - আসিয়ানী -

মোর ভাঙ্গিলু তুই.কুশিয়ার খুয়া দাত

তোর পিছা করিম মুই কালীর বাজারটাত।"

সংগ্রহসূত্র ঃ খুশী সরকার, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর।

আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে এই গানগুলি বিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে নবরূপ লাভ করেছে। খন গান এই গানগুলিরই বিবর্তিত প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। খন গানের বিবর্তনকে এভাবে দেখাতে পারি—

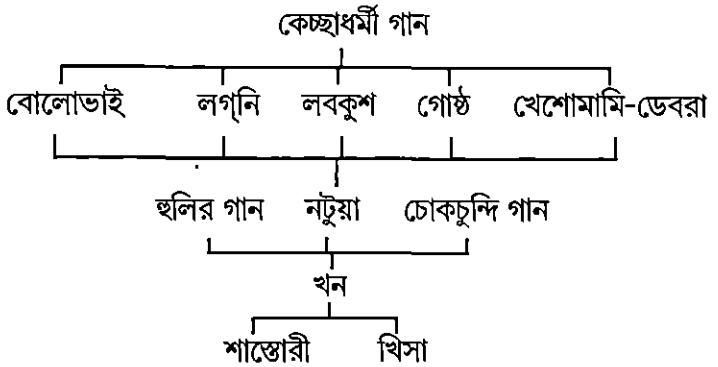

খন পালার বিষয়বস্তু সমাজে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে নেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রেমই মূল উপজীব্য। যেহেতু আঞ্চলিক অর্থে 'খন' হল কেচ্ছা বা কাহিনি। এক সময় গ্রামাঞ্চলে আনন্দ বিনোদনের জন্য নতুন নতুন খন গান তৈরি হত। খন গানের বিষয়বস্তু চিরন্তন পরিবর্তনশীল, তা সত্ত্বেও দেখা গেছে পুরনো খনের পালাগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মাহাত্ম্য। আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে উত্তরবঙ্গে ভাগবত চর্চার প্রসারের সাথে সাথে সমাজে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গুরু অর্থাৎ গোঁসাই-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। সমসাময়িক পালাগুলিতে শাস্ত্রবিষয়ক তর্ক আলোচনা লক্ষ করা যেত। আবার কোনো কোনো পালায় গ্রামীণ জীবনে গুরুদের ভণ্ডামি ও নষ্টামি প্রতিফলিত হয়। যেমন— বর্মোশরী। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকায় শাস্ত্রীয় খন পরের দিকে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। অন্যদিকে খিসা খনে অসামাজিক কাজকর্ম, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি বিষয় স্থান পেত। ফলে এক সময় শাস্ত্রীয় খনের জায়গা দখল করে খিসা খন। এর পেছনে কারণ অবশ্যই রয়েছে। এ যুগের মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, অলৌকিক ভাবের জগৎ থেকে বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তন। পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রের কাহিনির অসারতা বারবার তা প্রমাণ করেছে। সেই সময় পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে সমাজে প্রতিফলিত বাস্তবতা তাদের কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। এদিকে সমাজের গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব গুরুর পদমর্যাদাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। তাই শাস্তোরী

খনের গান আজকের দিনে আর তেমন শোনা যায় না। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয় রয়েছে। কিছু কিছু খন পালা এখনও জনমানসে সমাদৃত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. শিশির মজুমদার বলেছেন, "প্রতি বছরই গ্রামে গ্রামান্তরে নানান খণ্ড হয়। তা থেকে নির্বাচিত খণ্ড নিয়ে 'খন' তৈয়ারি হয় বছর বছর... এক বা একাধিক। নতুন 'খন্' পুরোনো 'খন' এর স্থান দখল করে।... পুরানো খন যে সবসময়ই একেবারে বাতিল হয়ে যায়, তা নয়, নতুন খনের পাশাপাশি বহু পুরানো খনও এই সময় শোনা যায়। পুরানো খন-এর অস্তিত্ব নির্ভর করে তার জোরালো কাহিনী, নাটকীয়তা ও গঠনপদ্ধতির ওপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঢাকোশোরী' পালা উল্লেখযোগ্য।"[২৩] কিন্তু খিসা খন অর্থাৎ সমাজের যে কোন সমস্যা নিয়ে রচিত পালাগুলি এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। শুধু তাই নয় খন গান এখানেই থেমে থাকেনি। খন গানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পেছনে মূল কারণ ছিল সমাজজীবন নির্ভর সত্যমূলক স্থানীয় ঘটনা, যা নিয়েই খন পালা লেখা হত। এইসব সত্যমূলক ঘটনার মধ্যে কলঙ্কজনক ঘটনার প্রাধান্যই বেশি। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে শাস্তি ও লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় সেই খনটি অনুষ্ঠিত হত। তাতে করে সেই ব্যক্তি লোকসমাজে নিদারুণ অপমানের মুখোমুখি হতেন। আবার যখন সমাজের কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি এর শিকার হতেন, স্বভাবতই তিনি সেই পালা বন্ধ করার জন্য তৎপর হতেন। এভাবে আইন ও পুলিশ বলে বেশ কিছু খন পালা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২৪] মামলা মোকদ্দমাও চলেছিল বহুদিন। অনন্যোপায় হয়ে লোকশিল্পীরা খনে আনলেন পরিবর্তনের ধারা। এক্ষেত্রে ঘটনা অপরিবর্তিত রইল কিন্তু চরিত্রগুলির নাম বদলে দেওয়া হল। এ ধরণের খনগুলি হল, সাইকেলসরী, হেজাকসরী, কারেন্টসরী প্রভৃতি। এর ফলে লোকশিল্পীরা দুটো দিক সমানভাবে বজায় রাখতে পারলেন। এক. কাউকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করাও হল না। দুই. সমাজের অসামাজিক ও অনৈতিক কাজকর্মগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হল। খন লোকনাটক শুধু প্রেম-প্রীতিতে আবদ্ধ থাকেনি, সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা তুলে আনার পাশাপাশি অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে নৈতিক বোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার রোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি গণচেতনামূলক খনও লিখিত হচ্ছে। তবে গত শতকের ৯০-এর দশকের পর থেকে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খন গানের বিষয়বস্তুতে বিবর্তন লক্ষণীয়। সামাজিক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের মুখে পড়ে লোকশিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী রূপটি দিন দিন স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে খন পালা লিখিত হয়।

'মায়্যাবন্ধকী' পালাটি বহু প্রাচীন পালা। তৎকালীন সমাজে বৈষ্ণবধর্মের হরিনাম মন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার, গুরু সেবা প্রভৃতি ছিল লোকজীবনের অন্যতম অঙ্গ। গুরু সেবা দেওয়ার জন্য রঙ্গিয়া কর্তৃক স্ত্রী কিরণকে বন্ধক দেওয়া সমাজের প্রাচীন দাস প্রথাকে মনে করিয়ে দেয়।

"রঙ্গিয়া ঃ কি আর শুনিবো রে কন্যা

মোর দুঃখের কথা
কথা কহিতে ওরে কন্যা
হিয়া যায় ফাটিয়া
পায় ধরিয়া কহিনু কথা
তবু ত বুঝে না
বড় দাদা হইয়ারে কন্যা
চাউল্লা নিলে কাড়িয়া
কিরণ, শুন মোরে কথা
তরে লইয়া যাম মুই বন্ধকী থুবা
অতয় করে বুঝানু তোক
তবু ত আর বুঝিলো না
গুরুর সেবা দিমরে কন্যা বন্ধকী থুইয়া।

কীরণ ঃ বাফো যুগে নাই শুনরে মুই
নয়া নয়া কথা
গুরুর সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া
কী শুনালেন স্বামী ওগে নয়া কথা
মায়াটাক বন্ধকী থুইয়া স্বামী
দেছেন গুরুর সেবা।" (মায়্যাবন্ধকী পালা)

মেয়েকে 'বন্ধক' বা বিক্রয় করার প্রথা একসময় বঙ্গীয় কৌম সমাজে প্রচলিত ছিল। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই দাস প্রথা এখনও কিছু কিছু নিম্নবর্গীয় কৌম স্তরে রয়েছে। সেটা দারিদ্র কিংবা সামাজিক ব্যাভিচার যে কারণই হোক না কেন। জমিদার-জোতদারদের শঠতা লাম্পট্য, ছলনা, প্রতারণা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে এই পালায়। পাশাপাশি আদিম কৌম সমাজগুলিতে মাতৃতান্ত্রিকতার অবক্ষয়ের রূপটি স্পষ্টত চোখে পড়ে। গুরুসেবার নাম করে ধর্মীয় প্রভাব মানুষকে কিভাবে দুর্বল করে দেয় তার পরিচয় এই পালাতে পাওয়া যায়। সামাজিক অপরাধের বিচার হয় দশজনের সামনে অর্থাৎ গণ আদালতে। অর্থবানদের প্রভুত্ব সমাজের উপর থাকলেও সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের কাছে তারা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গভীর প্রভাব এই গণ আদালতের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে।

'তেভাগা' খনটি ১৯৪৫-৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। পরাধীন ভারতের জোতদার, জমিদার এবং সুদখোর মহাজনেরা কিভাবে দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত

তার পরিচয় পাওয়া যায় এই খনে।

"গাউন ঃ উচল-খাল কাটি মাহাজুন
জমিখান কনু বারা-বোট
ইখান জমি ও মাহাজুন
আধি ছাড়াইস না মোর
তোর মুই পা ধরুং মাহাজুন পা ধরং
পা ধরিয়া কহুং মাহাজুন
না করিম এনং কাম
তোর জমি ছাড়া ও মাহাজুন
মুই কেনং করি খাম।" (তে-ভাগা খন)

তারা চিরকাল এই অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে যায় নি। ভূমিহীন কৃষক, বর্গা, মজুররা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠেছে। শুরু হয়েছিল মালিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে সংঘাত। কৃষকদের মধ্যে এই আন্দোলনের বীজ পুঁতে দিয়েছিল কিছু শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তি।

"বসন্ত ঃ উদাসু তোমাদের ঐ কর্জা ধান খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জমি আধি করবে জমির উপর তোমার সত্ব থাকবে। আধি করলে তুমি হবে অর্ধেক জমির মালিক। আধি জমির সত্ব তোমাদের আদায় করতে হবে।" (তে-ভাগা খন)

সমস্ত বিপদকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে কৃষকেরা সেই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার পাশাপাশি জমিদারী-জোতদারী প্রথা লোপ, ফসলের তিন ভাগ আদায় প্রভৃতি দাবি নিয়ে তারা আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকে 'জেল ভরো' দাবিতে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করে আন্দোলনকে বৃহৎ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছে।

'হাগড়ু-ভাদ্‌রী' পালাটি প্রেম-প্রীতি বিষয়ক সামাজিক পালা। ভাদ্‌রী ও হাগড়ুর বাবা-মা পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত। সন্তান বড় হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক পিতা-মাতার কর্তব্য। কিন্তু গ্রামের অর্থনীতি নির্ভর করে ফসল উৎপাদনের উপর। তাই ঐ বছর ফসল ভালো না হওয়ায় ভাদ্‌রীর বাবার পক্ষে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে ভাদ্‌রী ও হাগড়ু পরস্পরের প্রতি আসক্ত।

"হাগড়ু ঃ (স্বগত) দেখু, কেবা ত সিনান কইরবা আলি। অয়ত এই পোখর খানতে সিনান করে। যাউ, দেখেই আসু।

(গান)

ঐ না কি করেছি ভাদরী বহিন

ঘাটে বসিয়া,

তোর রূপে মুই পাগল হয়্যা

বেড়াসু ভাসিয়া।।

তোকে না দেখা পাইনু মুই

ঘাটত আসিয়া।।'

ভাদ্‌রী ঃ (গোপনে) আচ্ছা ক্যামন পাগল হইচে। এর মনটা একনা পরীক্ষা করুতো।

(প্রকাশ্যে) হাগে দাদা, তোর কি লজ্জা শরম আছে কি নাইতে?

(গান)

ঐ না কুন কথা কহিনু দাদা

লজ্জায় কইলু না,

আমার বাবা জানতে পাইলে

জীবনে রাখিবে না।।" (হাগড়ু-ভাদ্‌রী পালা)

তারা সামাজিক বাধা, অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে উপেক্ষা করে বিয়ের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পথে ঘুষড়ু ও দারোগা বাধার সৃষ্টি করে। শেষে লোকভয় ও আইনের তোয়াক্কা না করে তারা কালীমন্দিরে গিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'সুখ ও শান্তির কথা' পালাটিতে দেখানো হয়েছে গ্রামের সাধারণ লোকেরা অসুখ-বিসুখে ঝাড়ফুক-মাহাতালিতে কতটা নির্ভরশীল। উপযুক্ত চিকিৎসা না করিয়ে এই সমস্ত জলপরা, তেলপরা, ঝাড়ফুক প্রভৃতির উপর নির্ভরতার ফল অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

"শশধর ঃ হইলে নিতে কি। ঐ কলার ছুয়াটার অসুখ। খালি কান্দে আর কিছু খাবা চাহেনি, ঐ তাংনে মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা যাহুং। পাড়ার মানুষলা কহচে ভুত ধরিয়া-বাতাস ঠেকিয়া জলপরা, তেলপরা দিলেই ভাল হই যাবে।

শান্তি ঃ তমাক আর কত বুঝাব শশধর দা। তোক আর জলপরা আনিবা যাবা হবা নহা। মোর ঠিনা ঔষধ ছে- চল ছুয়াটাক ডাক্তারের ঠিনা নিগাই। ডাক্তারের ওষুধ খাইলে ভাল হই যাবে। এত দিন হইল ছুয়াটাক সাব সেন্টারত পাঠালু নি ইনজেকশান দিবা।

শশধর ঃ বহিন ঐলা কামা সর্বনাশ। ছুয়ার ইনজেকশান মোক খুবেই ভয় নাগে। বহিন তোর দোহাই নাগে- ছুয়াটাক ইনজেকশান দি ওষুধ দিস না। মুই গেনু মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা।" (সুখ ও শান্তির কথা)

এই পালায় শান্তিদিদি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। গ্রামের মানুষগুলিকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করতে পোলিও, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে সচেতনামূলক প্রচার করার উদ্যোগ নিয়েছে সে। সে জানে এসবের পেছনে মূলত অশিক্ষাই দায়ী। কেবলমাত্র একজন স্বাস্থ্যকর্মীই নয়, অভিভাবক হিসেবেও পুতুলকে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। জন্ম ক্ষণ নথিভুক্তকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিও উঠে এসেছে এই খনে। 'কামেই মোর অধিকার' পালায় প্রচারধর্মীতা প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত না থাকায় কাজের অভাবে বহু মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয়। অর্থাভাব, অন্নাভাব মানুষকে বাধ্য করে দালালচক্রের ফাঁদে পড়তে। সুযোগ সন্ধানী কিছু মানুষ তাদের ভিন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে কমিশনে অর্থ লাভ করে—

"পাইকারু ঃ মানুষের কারবারি করি মুই ভালয় টাকা কামানু। ৫০ ঝন কামাইল নিগাই দিবা পারিলেই পাঁচ হাজার টাকা কামাই। পেলকা দিল্লী খাটিবা যাবার কাথা ছিল। পেলকা- পেলকা বাড়ি ঘরে ছিস।

পেলকা ঃ হে ছুং তো পাইকারু দা।

পাইকারু ঃ বিদেশ খাটিবা না যাবা চায়হালু।

পেলকা ঃ যাবা চায়হালু দাদা। আর যাবা হবা নাহা। হামার এত্তিনায় মেলায় কাম। সরকার হামার তাংনি ১০০ দিনের কাম দিয়া। বাড়ির কিছু জমি-জমা আর সরকারের ১০০ দিনের কাম, দিন চলি যাবে। দিল্লি খাটিবা যাবা হবা নাহা। আর একট খবর পানু, দিল্লি খাটা নোকলা বঁচেনি। মুরগির রোগের মতন টুপতে টুপতে মরি যাহা। দিল্লি খাটি হামার রতন মারা গেল। জানি শুনি নাই যাম দাদা মরিবা।"

(কামেই মোর অধিকার)

কিন্তু ভিন রাজ্যে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের দিন কাটাতে হয়। সেখান থেকে ফিরে আসে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে। এদের মধ্যে অনেকের মৃত্যুও হয়। অমানবিকতার চরম নিদর্শন এই মানুষ কেনাবেচার দালাল। তাই অর্থাভাবে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া রুখতে সরকার থেকে ১০০ দিনের বরাদ্দ কাজের জন্য জবকার্ড বিতড়ন করা হয়। এই ১০০ দিনের বরাদ্দ কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের অনেক দারিদ্র পরিবারের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গ্রামগুলোও উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে। লোকসাংবাদিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই পালাটি।

নটুয়া ঃ

তরাই অঞ্চলে জিতুয়া অষ্টমীর দিন বিভিন্ন ধরনের রঙ্গ-তামাশার গান প্রচলিত। এর মধ্যে অন্যতম ছিল কলসী বা টেমকীর গান। একে কেলাচাও বলা হত। সমাজে ঘটিত নানা ঘটনা তুলে ধরা হত এই গানে।

৫-৭ জন মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুখে মুখে এই ধরনের গান গাইত। যেমন—

"বাঘ ভাই বাঘ ভাই ডাকি তুমাকে হে
ওরে এই নিদানে নাই আসিলি
লইজ্জা হোবে তোরে
ওরে মিছাতে গেনু মুই রাজাডার বাড়ি
মুই তো মারি রে গেছু দুরি।"

সংগ্রহসূত্র ঃ খাদা সিংহ (৬৭), ডোহাগুড়ি মোড়, অধিকারী, খড়িবাড়ি।

কলসীর গান ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শাস্তোরী ও অশাস্তোরী রূপ ধারণ করে। পুরাণ ও বিভিন্ন শাস্ত্রাদি থেকে বিষয় নিয়ে রচিত হয় শাস্তোরী পালা। আর সমাজের নানা কুৎসা কাহিনি প্রভৃতি সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত হয় অশাস্তোরী। এই কেচ্ছাধর্মী গান থারো হুলি নামেও পরিচিত। যেমন—

"তোর সইডা মরিয়া গোছোই মুই হইচু বেনিয়া
এলা নাগে ওগে সই মুই যেই ঢেনার ঢেনা
মাওরিয়া ছুয়াডার কাহাইতে
দিন মোর যাছে গে নিছুহো
হাতের কামলা সই মোর হাতে না আসে
প্রাণ মোর রাখি দিছু কনেক আলিঙ্গন দিয়া
জন্মের মতন সই গে হয়া
ওকি ওহো মরি হে
ওকি হায়রে মরি হায় হায় রে।"

সংগ্রহসূত্র ঃ তারন সিংহ (৫৬), ডোহাগুড়ি মোড়, অধিকারী, খড়িবাড়ি।

অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরবঙ্গেও ভাগবতের শাস্ত্রীয় প্রভাব পড়ার সাথে সাথে লোকাচার, ব্রতকথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত পড়ুয়া গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে এই তরাই অঞ্চলে। অনুমান করা যায়, পরবর্তীতে থারো হুলির মত গানগুলিতে ভাগবতের প্রভাব পড়েছিল। যদিও এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধা-কৃষ্ণের চাইতে লোকায়ত রাধা-কৃষ্ণের প্রাধান্যই বেশি। তাই নটুয়ার উদ্ভব প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে —

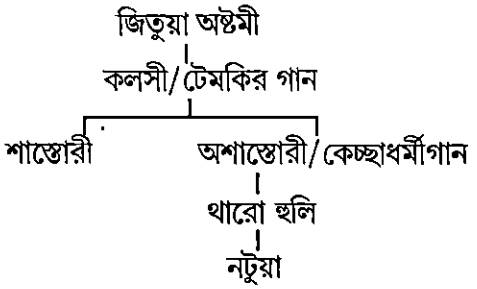

রাধা-কৃষ্ণ এখানে একেবারে লৌকিক। বিরোথ ও কুঞ্জ — এই দুটি পর্যায়ে নটুয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও স্থান ও কালভেদে এর বিষয়ে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে এই দুটি পর্যায়ে বিরহের সুরই প্রধান।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে উপজীব্য করে 'নটুয়া' পালা রচিত হলেও এর মধ্যে কাহিনিগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণবিচ্ছেদে রাধার বিরহ বেদনা বিরোথ পর্যায়ে অধিক প্রতিভাসিত হওয়ায় এই পর্যায়ের জনপ্রিয়তা অসীম। তুলনামূলকভাবে কুঞ্জপর্যায়ে রাধার কুঞ্জ সাজিয়ে কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ভোগবাসনার প্রাধান্য। কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তিই হল চরম সাধনা। এই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই প্রথমদিকে কুঞ্জপালা অভিনীত হলেও বর্তমানে এই পর্যায়ের গান তেমন পাওয়া যায় না। কুঞ্জ পর্যায়ে পরস্ত্রী রাধা কুঞ্জ সাজিয়ে প্রতীক্ষারত। পরবর্তীকালে কিছু কিছু অঞ্চলে যে নটুয়া প্রচলিত ছিল তাতে যুবতী রাধার বালক স্বামী কৃষ্ণ। আবার কখনও রাধার দই-দুধের ভার বহন করে কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম নিবেদন করছে। এখানেও রাধা কৃষ্ণের মামী। বিবাহিত স্ত্রী নন, তিনি কৃষ্ণের প্রেমিকা। যুবতী পরস্ত্রী রাধাই আবার কালের বিবর্তনে নটুয়া শিল্পীদের হাতে কৃষ্ণের মামী থেকে পরিবর্তিত হয়েছেন উধব-মাধবের মামীরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণের স্ত্রী হিসেবে। ফলে কাহিনিতে কিছুটা হলেও এসেছে রূপান্তর। যেমন, কৃষ্ণকে যেখানে বলতে শুনি—

"ভাল্ ভাল্ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহা নাই কাইন করিম তোরে।"

এখানে কৃষ্ণের সাথে রাধার প্রেম অবৈধ আবার পরবর্তীকালের নটুয়া গানে রাধার মুখে শুনি—

"খাটো খুটো বৃন্দাবনে,
ফুল তুলিবা গেনু তিনঝনে
ফুল তুলিতে হারানু স্বামীরে,
সায়া গেল মোর বৃন্দাবনে।"

উদ্ধৃতিটি থেকে বোঝা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে মনে প্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক লোকনাটকের কাহিনির ক্ষেত্রে তেমন বিবর্তন লক্ষ করা যায় না। নটুয়া লোকনাটকও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তবে নটুয়ায় ব্যবহৃত ফাকরি বা ধাঁধাগুলি প্রায় প্রতিবারই বদলে যায়। সমসাময়িক সমাজজীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক উপাদানগুলি এতে সজীব হয়ে ওঠে। রাধার বিরহের

সাথে একাত্ম হয়ে চরিত্রগুলি অনুরূপ কোন বেদনাদায়ক বিষয়েও চলে যায় অভিনয় চলাকালীন। এখানে উল্লেখ্য আদিতে নটুয়ায় হয়তো ফাকরির ব্যবহার ছিল না। এটি সম্ভবত পরবর্তীকালের সংযোজন।

এই 'নটুয়া' পালাটিতে কুঞ্জবান পর্যায়ের একটি গান তুলে ধরা হয়েছে।

"সরিষার ত্যালত্ দিয়া রাম
জুড়ি গেইল্ বাতি।
সইন্‌ঝা করিতে আইলে এহো সইন্‌ঝা
... ...
কুঞ্জ না বান্দিয়া কুঞ্জের দেখে উপ।
কুঞ্জতে নিখিয়া দিলে চান্দ আর সুরজ।।
... ...
সোনারে আরুণী আধে গে, উপারে ঝাড়ুনী
উঠো আধে, বান্ধো কেশ;
বাহুড়ো আঙিনাখান গে।।"

শ্রীরাধা কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষায় সন্ধ্যাবেলায় কুঞ্জ তৈরি করে তাতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এরপর উঠোন ঝাড় দিয়ে সযত্নে চুল বেঁধেছেন। সখি ললিতাকে দিয়ে ফুল-পাতা এনে কুঞ্জ সাজিয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও কৃষ্ণ আর আসে না। রাধার এই কুঞ্জসজ্জা ব্যর্থ হল। এভাবেই এই গানটিতে শ্রীরাধার অন্তরের বিরহ প্রকাশ পেয়েছে।

"চোখ খাইলে বাপো মাও রে আরো টোলার লোক
ছোটো দেখে বিহা দিলে হে কোলের বালক।
স্বামীকে কোলে লয়ে গো চলিলাম বাজার
বাজারের লোক শোধাই গো, কে লাগে তোমার।
... ...
বাবাজীকে বলো গিয়ে গো কিনবে ধেনু গাই
সেও দুধায়া খিলায়ে আমি গো স্বামীকে বাঁচাই।।"

নটুয়ার এই পালাটিতে যুবতী নারী তার বালক স্বামীকে নিয়ে মহা বিড়ম্বনায় পড়েছে। স্বামী কোলে বাজার গেলে লোকে উপহাস করে। এহেন ভাগ্যের জন্যে সে পিতা-মাতা-প্রতিবেশীদের দোষারোপ করেছে। পিতার কাছে বালক স্বামীর ভরণপোষণের জন্য ধেনু গাই-এর আব্দার করে। সেই গাইয়ের দুধ দুইয়ে যুবতী জীবিকা নির্বাহ করবে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর শ্রীরাধার মতো 'নটুয়া'র রাধা দই-দুধের ভাণ্ড নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় নদী পার হয়েছেন। নদী পার হবার সময় রাধা কৃষ্ণের মনোবাসনা জানতে পারে।

"কৃষ্ণ ঃ ভাঙ্গা নাহি টুটা নাহি বজরিয়া ভারি
হাতি ঘড়া পার করু তুই কতয় ভারি
কেশবা ছাড়িয়া রাধে গড়ায় চাপে বস
মুটে মুটে পানি ছেক লজ্জায় কেন মর
কাচলি চিড়িয়া রাধে গারিনু সকল
প্রাণ শান্তি হইয়া রাধে টুটে গেল জল্।

রাধা ঃ বহেরে দক্ষিণা বায় টলমল করে লাও
ডুবাইলো মোক আগম দরিয়ার জলে

কৃষ্ণ ঃ কোথা হইতে আইলো রাধে কোথায় তুমার ঘর
কিসের প্রসাদ আছে মস্তকের ওপর।

রাধা ঃ দহি আছে দুধ আছে খাওরে কানাই
সেই তুমার মনে আছে তাই তো হবার নাই।
পরের রমণী দেখিয়ে কানু জলে কেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায় কানু বেহা কেনেনি কর।

কৃষ্ণ ঃ ভাল্ ভাল্ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহা নাই কাইন করিম তোরে।"

বিনিময়ে রাধা তাঁর দুধ-দই সমস্তই কৃষ্ণকে প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু নিলাজ কৃষ্ণ তাতে রাজি না হলে ক্রুদ্ধ রাধা জানায় পরস্ত্রী দেখে কানু কেন জ্বলছে, সে নিজেই তো কন্যাপণ জোগাড় করে বিয়ে করতে পারে। 'নিজের জান ভাঙ্গায়' অর্থাৎ টাকা উপার্জন করে কন্যাপণ জোগাড় করা। বহু প্রাচীনকাল থেকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বা আদিম কৌম সমাজে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অলস কৃষ্ণ জানিয়ে দেয় যে তাঁর ভাগ্যে বিবাহ নেই, তাই সে রাধাকেই তাঁর উপপত্নী করবে। সেই রাধাই পরে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল। কৃষ্ণের বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গমন রাধাকে বিরহিনী করে তোলে।

কৃষ্ণের বাঁশি রাধার মনকে উত্তাল করে তোলে। দূরদেশে গেলে কৃষ্ণকে সর্বদা মনে পড়বে বলেই রাধা কৃষ্ণের মোহনবাঁশি নিজের কাছে রাখতে চান—

"রাধা ঃ তোমা যাবেন দূর দ্যাশে প্রভু হামার পড়িবে ধান্দাওয়া
তোমার হাতে মোহন বাঁশী রাখি দেহ বান্দাওয়া

গীত ঃ মাওরে হনু আমনার মন্দিরের ঘর

রুমুনী রে রুমুনী গেল হারায়।

রাধা ঃ আয়রে আয়রে হাঙেশা পুছ তোরে জ্ঞান

দুঃখতে পড়িয়া হারানু বুদ্ধি আর জ্ঞান।

শিবকো দুয়ারো মে ইরঙ্গ বেরঙ্গ ফুলও

হে শিবো মুই হারানু কলার হায়রে স্বামীধন।"

কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধার জ্ঞানবুদ্ধি সমস্তই লোপ পেয়েছে।

আবার কখনও দেখি শ্রীরাধার আক্ষেপ ছোট বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছে, কি করে সে শ্বশুর বাড়ি যাবে—

"গীদাল ঃ বাপো মায়ে নাহি বুঝে ছোটতে বেচিয়া খাচে

কেমনে যাইমু শ্বশুরালী গো

বয়স হল মোর লবীন।'

বৃন্দাবনে ফুল তুলতে যাওয়াই তাঁর কাল হল।

"গীদাল ঃ খাটো খুটো বৃন্দাবনে, ফুল তুলিবা গেনু তিনঝনে

ফুল তুলিতে হারানু স্বামীরে, সায়া গেল মোর বৃন্দাবনে।"

তিনি কৃষ্ণকে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেললেন। তখন উধব-মাধব মামী রাধার দুঃখ দেখে মামা কৃষ্ণকে খুঁজতে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়—

"উধব-মাধব ঃ মামি তোমা কান্দেন নি। হামা দোনোঝন যাছি মামাক অনষেবার।"

এখানে উধব-মাধব চরিত্র দুটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বড়াই'- এর ভূমিকা পালন করেছে। যৌবন জ্বালায় অস্থির রাধা কৃষ্ণ বিহনে একা থাকতে পারছেন না—

"গীদাল ঃ এখেতো আন্ধার রাতি

একাশরে রহালনি যায়, ওহে পরভুজি

হায় দেখি মোর কপাল লেখারে

জার গেল মোর কাপড়া বিনে

একাশরে রহালনি যায়

গোকুলা নগরে, ওহে পরভুজি।"

কৃষ্ণবিরহে শীত চলে যায় বিনা কাপড়ে। স্বামী ছাড়াই যৌবন চলে যাচ্ছে।

পালাটিয়া ঃ

পালাটিয়া লোকনাটককে আমরা এখন যে রূপে দেখতে পাই পূর্বে তা ছিল না। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অন্যতম প্রাচীন ঢাকের গানকে লোকনাট্যের পূর্বতন রূপ বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ময়নাগুড়ি অঞ্চলের অন্যতম গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক দীনেশ রায়ের কাছে সংরক্ষিত ড. চারুচন্দ্র সান্যালের একটি অপ্রকাশিত গানের তালিকা থেকে জানা যায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন গান ঢাকের গান। ফাল্গুন পূর্ণিমার দোল বা হুলি উৎসবে ঢাক বাজিয়ে ছোট ছোট পালা অভিনীত হত। এই হোলি গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল 'বড় লম্বা আকারের একধরনের ঢাক'। ঢাকটি এতটাই বড় যে দুজনকে সেটি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত। তাই একে সাঙি ঢাক বলা হত। সাঙি ঢাক বাজিয়ে খোলা মঞ্চে পরিবেশন করা হত ঢাকের গান।[২৫] হোলি উৎসবে এই ঢাকের গান পরিবেশিত হত বলে এর অপর নাম ছিল হোলির গান। হুলি গান 'হোলিকা' উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কালক্রমে হুলির গান স্থানীয় ধামগুলিতে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। হুলির গান উপলক্ষে রাজবংশী সমাজে বিচার ব্যবস্থার প্রত্নরূপ আজও লোকনাট্যের রূপে পরিবেশিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে হোলি গানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — সরু ও মোটা হুলি। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকও হোলির গানকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখেছিলেন—"তিস্তার পূর্ব পাড়ে বিশেষত ধূপগুড়ি থানায় হোলির গানকে সরু ও মোটা দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। বিশেষণ দুইটি লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় ইহার দ্বারা গানের কোনো নির্দিষ্ট সুর বা কোনো রচনারীতি নির্দিষ্ট হইতেছে না। ইহা বিষয়কে নির্দেশ করিতেছে।"[২৬] মোটা হুলির গানের বিষয়বস্তু প্রেম এবং তা আদি রসাত্মক। তবে এখানে কেবল অবিবাহিত যুবক-যুবতীর প্রেমই নয়, অবৈধ প্রণয়ও স্থান পেয়েছে। আবার স্থানবিশেষে মোটা হুলির গানগুলিকে 'ভেড়া ছুবার গান' বলা হয়ে থাকে। তবে সেক্ষেত্রে গানগুলি খুবই অশ্লীল। মোটা হুলির উদাহরণ—

"বাপ-মড়াটার মুখত্ লইজ্জা নাই ,
ভাই-মড়াটার মুখত্ পড়ুক ছাই।
বিহোর ব'স মোর চলিয়া যা'ছে
ব্যাচেয়া খালেক্ নাই।।
বাপমড়া, তোক ভাত আন্দিয়া দিম্
দনো হাতে খাইস;
এক নোটা জলের বাদে
মোক যদি ডাকাইস—
ও মুই শুনিয়া শুনিবা' না হওঁ
বাপমড়া, অধিক ডাকালে
টেঁটোয়ারা ধরিম্ টিপিয়া।।

ওকি ও মরি রে,

মাটির দেহা মাটিয়ে খাবে

'—' ভাতারটা নগদ্ যাবে;

বাড়ির চেঙ্গেড়ার মন আখিলে

কত নাম করিবে।।"[২৭]

অপরদিকে সরু হুলি গানে স্থান পায় বৎসরের বিভিন্ন স্থানীয় ঘটনা ও কলঙ্কজনক কাহিনি। যেমন—

"ও হে কলিকালের চেংড়িলা

উমাক কিছু ভাই না যায় কহা

সাজনি সাজেছে কেমুন রে

গাউনের ছকরা।

হাতত্ নিছে একটা রবাটের ঝলা

ও কিরে দারুণ বিধাতা

উমাক কিছু ভাই না যায় কহা।"

(সংগ্রহসূত্র ঃ ভবেশ রায় (৬২), কুকুরজান, জলপাইগুড়ি।)

এই পর্যায়ের হুলি গানে ছোট ছোট পালা ও কিছু গান পরিবেশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সামাজিক প্রণয় কাহিনি। সরু হুলির গানগুলি মনে রাখার জন্য অনেক সময় লিখে রাখা হত এবং সংলাপ অংশ আসরে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করা হত। খাতায় লিখে রাখার কারণে এর নাম হয়েছিল খাতা হুলি। খাতা হুলির পালা স্থানবিশেষে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঙ্গুয়ার পালা, ঘরজেয়ার পালা, দুই সোতোনী, সাদা বাউরা প্রভৃতি। হুলি গানে গীদাল ও দোয়ারী গান এবং সংলাপের মাধ্যমে পালাটিকে উপস্থাপিত করে। এই পর্যায়ের হুলি গানগুলি কাহিনি ও সংলাপ যুক্ত হয়ে ক্রমপর্যায়ে পাটপালা এবং পালাটিয়া পালায় রূপান্তরিত হয়েছে তা নিম্নে দেখানো হল—

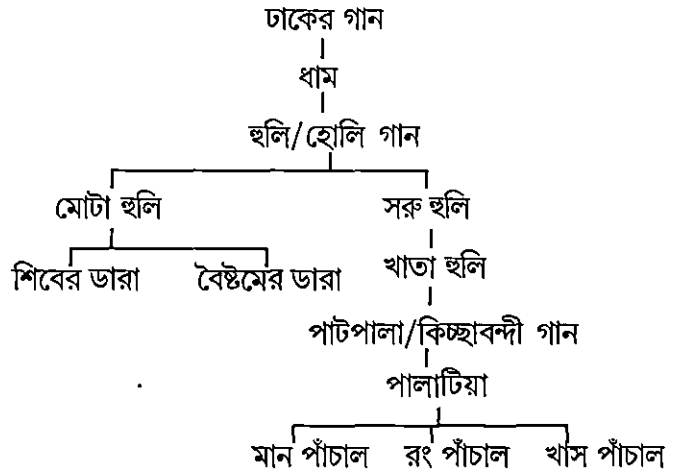

সরু হুলি থেকে খাতা হুলি এবং খাতা হুলি থেকে পাটপালা বা কিচ্ছাবন্দী গানের উদ্ভব হয়েছে। কিচ্ছাবন্দী গানে পালাগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এক একটি পালা প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। এই গানগুলিতে সমাজের অর্থাৎ স্থানীয় অঞ্চলের 'কিচ্ছা' অর্থাৎ প্রচলিত লোকগল্পগুলি পালার আকারে পরিবেশিত হত। পরবর্তীকালে এই কিচ্ছাগানে বিভিন্ন বিষয় অর্ন্তভুক্ত হয়ে পালাটিয়ায় পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। পালাটিয়া গান সম্পর্কে এই অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, সেটি হল—

'পালাটিয়া হুলির গান
চেংরালার হোলেক মান।'

এ থেকে পালাটিয়া সঙ্গে হুলি গানের একটি সম্পর্কসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

পালাটিয়া গানের আদিপর্বে সমাজে ঘটিত কলঙ্কজনক কাহিনি, অসামাজিক প্রেম ইত্যাদির পাশাপাশি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনি সমন্বিত মানপাঁচালীর পালাগুলি গ্রাম্য সমাজে বহুল পরিমাণে সমাদৃত হত। কিন্তু যত দিন গেছে আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ইতিহাস, পুরাণ বা শাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তার জায়গা নিয়েছে রং পাঁচাল ও খাস পাঁচাল। এই পালাগুলিতে ব্যক্তিগত কুৎসা, অবৈধ প্রেম, অসামাজিক কর্ম প্রভৃতি অভিনয়ের মাধ্যমে আসরে সমবেত গ্রাম্য সমাজের সামনে ফাঁস করে দেওয়া হত। এতে করে সমাজের সেই ব্যক্তিকে চরম হেনস্থার মুখোমুখি হতে হত। খন লোকনাটকের মতই পালাটিয়াতেও মামলা মোকদ্দমা চলার ফলে বহু পালার অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই পালাটিয়াকে টিকিয়ে রাখতে লোকশিল্পীরা ঘটালেন রূপান্তর। কাহিনি একই রেখে অথবা কিছুটা পরিবর্তন করে পালা পরিবেশন করলেন। গিল্টিমিঞা ভেজালশ্বরী, হ্যাজাকবাবু মেন্টালশ্বরী প্রভৃতি পালাগুলি এর উদাহরণ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে ডাঙ্গুয়া প্রথা, ঘরজেয়া প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় পালাটিয়ার প্রথম পর্বে। এছাড়া এখানকার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জোতদারী ব্যবস্থা, জমিদারী ও মহাজনী ব্যবস্থাও উঠে এসেছে পালাটিয়ার পালায়। পরবর্তীকালে অবশ্য পালাটিয়া কেবল সামাজিক বিষয়েই আবদ্ধ থাকেনি, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও এতে স্থান পেয়েছে। যেমন, ভেস্টেশ্বরী পালা। শুধু তাই নয় পালাটিয়ার মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ, জনশিক্ষা প্রসার, সমাজ সচেতনামূলক বিষয়গুলির প্রচার কার্যও চালানো হয়েছে।

'কাঙ্ভাঙ্গা-ঢেঙপাড়ীর পালা'য় কাঙ্ভাঙ্গা নামে এক যুবক দেউনিয়াগিরি শেখার জন্য জালু দেউনিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হয়। 'দেউনিয়া' শব্দের অর্থ গ্রামের বা পরিবারের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। জালু দেউনিয়া একজন বড় দেউনিয়া ও ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। গুরুর বাড়িতে থেকে কাঙ্ভাঙ্গা দেউনিয়াগিরির পাঠ নেওয়া শুরু করে। কিন্তু জালু দেউনিয়ার স্ত্রী ঢেঙপাড়ী অর্থাৎ গুরুপত্নী শিষ্য কাঙ্ভাঙ্গার কাছে প্রেম নিবেদন করে—

"ঢেঙপাড়ী ঃ (গান) ও মোর বাপোই রে,

নাজের কাথা কভা' না মনায়।

· ধানটার পেট্‌ত চাউলটা বাপোই

· জানে না আর কাঁয়।।

কি ভাগ্যের কপালের ফলে

নিধি মোক ছলিল্ কুন্ ছলে হে;

অন্তরে মোর অঘনি জ্বলে,

শাগে-ভাতে না মিলিলে—

পেট ভরে কি চুয়ার জলে?

শুনিয়া তোর গুরুজীর রাও

জ্বলিয়া উঠে মোর গাও;

তোর লাখা স্বয়ামী যদি পাওঁ —

এলাও মুই হবা' পারুঁ

সাত ছাওয়ালের মাও।।"

(কাঙ্গভাঙ্গা-ঢেঙ্‌পাড়ীর কথা— পালাটিয়া)

'চিন্তাশোরী' পালায় সদ্যবিধবা চিন্তাশোরীর রূপে মুগ্ধ ফাঁকতাল যে কোনো প্রকারে তাকে পেতে আগ্রহী। এই উদ্দেশ্যে সে নানারকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। ফাঁকতালকে 'ডাঙ্গুয়া' করে নেওয়ার কথাও বলে—

"চিন্তাসরি ঃ গান

চিতুন বয়সে মোক আড়ি কন্নোরে

ও কি হায়রে নারায়ণ।

চিং ঃ দারুন বিধিরে ওরে কি দোসে

মারিলো মোর স্বামীধন

ওরে ধিক ধিক নারী এ ছাড় জীবন।

চিং ঃ দারুণ বিধিরে ওরে কি দোসে মারিলো স্বামীধন

ওরে স্বামীর শোগে মোর যাবে জীবন

ফাকতাল ঃ ডাকেছিৎ কান্দেছিৎ কেনে খালি দেহাটাক ফুরালো একেলায় যদি অভা না পারিস

তে ফাকতালটাক আনিয়া তুই ডাঙ্গুয়া

চিন্তাসরি ঃ হুই স্বামীটা ত মোর ঠিকে ভুত হইছে। অক যদি মুই না খেদাও তাহলে ত অত্তাচার

করিবে।" (চিন্তাশোরি পালা— পালাটিয়া)

রাজবংশী সমাজে এই 'ডাঙ্গুয়া' প্রথা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। 'ডাঙ্গুয়া' অর্থাৎ যুবতী বিধবার শক্তসামর্থ অথচ দরিদ্র যুবককে স্বামীরূপে গ্রহণ করার রীতি। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে ফাকতাল চিন্তাসরিকে স্ত্রীরূপে পায়না।

'দশ নম্বর আড়ি ঢেনা অধিকারী' পালায় গ্রামের এক সম্পন্ন জোতদার ও তার অধঃস্তন কর্মী মোড়লের চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। লোভী জোতদার ও তার মোড়ল বিধবা যুবতী ময়নার প্রতি আকৃষ্ট। ময়না এমন একজন বিধবা নারী যার নয় জন স্বামী গত হয়েছে। জোতদার ও মোড়লের মনোভাব বুঝতে পেরে সে দুজনকে জব্দ করার ফন্দি করে—

"জোতদার ঃ মোড়ল, তুই যদি ঐ চেংরিটাক নিয়া যাবার পারিস মোরঠে, তোর মাইনা বাড়ে দিম।

মোড়ল ঃ মাই, একটা কাথা।

ময়না ঃ কি কাথা।

মোড়ল ঃ তোক নিবার খিব পাগলা জোতদারটা। তুই কি নিবু।

ময়না ঃ তালে ওহো পাগলা, তোহও পাগলা। তো দ্যাখেক ভাই মোর একখান কাথা। পরীখ আছে যায় তোমরা ওই বাঁশানীতলার দিঘিটাত যায় ভেল্লা সমায় ডুবিয়া অভা পাবেন তাকে নিম।"

(দশ নম্বর আড়ি ঢেনা অধিকারী— পালাটিয়া)

জনৈক নেতা নামক ব্যক্তির বাঁশানীতলার দিঘিতে ডুবে থাকার প্রতিযোগীতা করতে গিয়ে যারপরনাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় জোতদার এবং মোড়ল। সে সময়ের অবস্থাপন্ন জোতদারদের নৈতিক অধঃপতন এবং পরনারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সাধারণ মানুষকে কিরকম বিড়ম্বনায় ফেলত তাই পালায় তুলে ধরা হয়েছে।

'পৈলসাঞ্জুর সংসার' পালায় গ্রামের বৃদ্ধ অধ্যক্ষ নাঠুয়া বিধবা আঙ্গাতির একমাত্র কন্যা মেনকাশ্বরীকে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে বুড়ির প্রাপ্য জি. আর ডবল করে দেয়—

"নাঠুয়া ঃ আঙ্গাতি বুড়িকতো এইবার ডবল জি.আর দিনু। দিনুতো ঠিকেই, দেখা যাওক। সঙ্গরাক আগত কও একটা বুদ্ধি করিবারে নাগিবে।

[চাক্কাউর প্রবেশ]

চাক্কাউ ঃ সঙ্গরা!— সঙ্গরা! বাড়িত আছেন না নাই।

নাঠুয়া ঃ কায় সঙ্গরা, আইস। মুই তোমারে কথা চিন্তা করেছো। আচ্ছা ভাই আগত বইস; একটা আরো ঘটনা; আঙ্গাতি বুড়ির যে বেটিটা আছে দারুণ ঢকরে ভাই।

চাক্কাউ ঃ কিতে নিবার চাছেন নাকি?

নাঠুয়া ঃ নিবার আরো কি, বিয়াওয়ে করিম। উয়ায় যেহেতু আকয়ারী মান্‌সি। উয়ারও মাথার জাবুরা ঘুচুক। সুখে খাবে, সুখে রবে। মোর কি কুনর অভাব আছে।

চাক্কাউ ঃ সঙ্গরা, তেমরা মারি ফেলালেন। পাটির যে যুগ, আরো হইসে যুব সংগঠন। এইটা কি কুনদিন হয়। তোমার বয়সে আর কইনার বয়সে এইটা কি আর বনে। আজিকালি যে যুব চ্যাংড়ালা খাড়ায় ধরি ফেলাবে।" (পৈলসাঞ্জুর সংসার)

কিন্তু পার্টির যুব সংগঠনের কথা মনে করিয়ে চাক্কাউ নাঠুয়াকে অন্যত্র মেনকাশ্বরীর বিয়ের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়—

"চাক্কাউ ঃ অনেকখান ভোল বুদ্ধি খাটেবার নাগে। আগত ইয়াক ঘজ্জেয়া থুইয়া বিয়াও দেই। আগত একটা সাদাসিদা চ্যাংড়া দেখ ওইটাক ঘজ্জেয়া থুইয়া বিয়াও দিম। হুটাতো কাম কাজ করিবার না হয়। তারপর হামরায় না হুটাক নিকিলি দিম।

নাঠুয়া ঃ তারপর সেলা কি করিয়া সঙ্গরা? পারা যাবে তো? তোমরা যেইটাই করিবেন ওইটাই মুই রাজি। যাতে নেওয়া যায়।

চাক্কাউ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ মোর নাম চাক্কাউ, মুই কতজনকাক আঠারো চাকার রথ দেখাইছু, হিটাতো ক্ষুদ্র, সেলা মোরটা হবে তো।" (পৈলসাঞ্জুর সংসার)

চক্রান্ত করে পৈলসাঞ্জুকে 'ঘজ্জেয়া' অর্থাৎ ঘর জামাই করে রাখা হয়। বিয়ের পর পৈলসাঞ্জুর অসঙ্গত আচরণে রেগে গিয়ে আঙ্গাতি নাঠুয়ার কাছে নালিশ করে। নাঠুয়া ও চাক্কাউ এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বলা মাত্র তারা এসে পৈলসাঞ্জুকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

"প্রধান ঃ মধুভাষি বাড়িত আছেন বাহে।

(মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ কায় ডেকাছেন? ও প্রধানদা তোমা, আইস, আইস, বইস।

প্রধান ঃ না না মুই এইঠে বসিবার আইসো নাই।

মধুভাষি ঃ খানিক তায় গুয়াপান খাও।

প্রধান ঃ দ্যাখেক মুই তোর ফাউকসালি কাথা না শুনো। বাকী খাজনার টাকালা কুনবেলা দিবু।

মধুভাষি ঃ প্রধানদা, মুই কোনঠে থাকি পাইসা দিম। মোরঠে তো এতলা পাইসা নাই। তোমরা মোক কনেক দয়া কর। মোক এইবেলা মাফ করি দেও।

প্রধান ঃ ঠিক আছে এমুন করি যেনং কবার ধচ্চিস, নে, এইবার তোর খাজনা মাফ। কিন্তুক মোর একখান শর্ত আছে।

মধুভাষি ঃ কেমুন শর্ত?

প্রধান ঃ ভালেদিন থাকি তোক দ্যাখেচু, তুই বড়ো দুখি মানষি। মুই-ও ভাই একেলা মানষি। তো মুই তোক নিবার চাছু। তুই মোরঠে আসিলে সুখত নবু। এলা তুই যদি রাজী থাকিস তাইলে তোর খাজনা মাফ করি দিম।"

(অতি চালাকের গালাত দড়ি)

'অতি চালাকের গালাত দড়ি' পালায় গ্রামের প্রধানের পরনারী লোলুপতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জমিজমা আত্মসাৎ করার প্রবণতা ফুটে উঠেছে—

"প্রধান ঃ চোকিদার মোর তো মনটা কছে সাদাসিদা এইঢক করি মানিবে না। উয়াক খানিক টাইট দিবার নাইগবে।

চোকিদার ঃ হুজুর, তায় কি করিবেন?

প্রধান ঃ মোর কতলা পাইসা নাই ফাকতে নিয়া নিলেক। একখান বুদ্ধি বার করির নাইগবে।

চোকিদার ঃ কি বুদ্ধি হুজুর?

প্রধান ঃ (কতখন ভাবিয়া) যা হাট-বাজারত ঢোল পিটি দেক—যায় বত্তা ঘোড়া এক কেজি পাল্লা দিয়া ওজন করিবার পারিবে তাক মুই অদ্ধেক সম্পত্তি আর মোর বেটিক দিয়া বিয়াও দিম। আর না পাইলে উয়ার যা সম্পত্তি থাইকবে তামান মোর নামে লেখি দেওয়া খাবে। (প্রস্থান)

(চোকিদার সেই নাখান ঢোল পিটি দিল)

চোকিদার ঃ শোনেন, শোনেন, শোনেন—হামার এই অঞ্চলত যায় একখান বত্তা ঘোড়া এক কেজি পাল্লা দিয়াওজন করিবার পারিবে তাক প্রধানের অদ্ধেক সম্পত্তি আর বেটিক দিয়া বিয়াও দেওয়া হবে। আর না পারিলে উয়ার যা সম্পদ থাকিবে তামান প্রধানের নামে লেখি দিবার নাইগবে।" (প্রস্থান)

(অতি চালাকের গালাত দড়ি— পালাটিয়া)

কুশান ঃ

কুশান লোকনাটকের কাহিনি মূলত রামায়ণনির্ভর তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এই রামায়ণ আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত। আর্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ৫০০-৪০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্য

জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অনার্যগোষ্ঠীর মধ্যেও রামায়ণ-মহাভারত জনপ্রিয়তা লাভ করে। যদিও মনে করা হয় রামায়ণ রচিত হওয়ার অনেক আগে জনজীবন ও সমাজে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি লোককথারূপে প্রচলিত ছিল। রামায়ণে বিবৃত গার্হস্থ্য জীবনের চিরাচরিত সম্পর্কের মধ্যে লোভ-কুটিলতার দ্বন্দ্ব, রাজ্য ও রাজত্বের জটিলতা, বিয়োগান্ত পরিণাম প্রভৃতি সহজেই জনমানসের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। তাই তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারের সাথে একীভূত হয়ে রামায়ণ বিভিন্ন রূপ লাভ করল। আদি কবির এই কাব্য যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। আর তার প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালের শিল্প, সাহিত্য ও জীবনচর্চায়। পঞ্চদশ শতকে সেই সংস্কৃত রামায়ণকে বাঙালি জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃত্তিবাস রচনা করেন 'শ্রীরামপাঁচালী', তখন তার মধ্যে ফুটে উঠল বাংলার লোকায়ত জীবন। তবে কৃত্তিবাসের পূর্বে কামতা - কামরূপে রামায়ণ লেখেন মাধবকন্দলী। তাই কোচবিহারের লোকসাহিত্যে তাঁর প্রভাবই বেশি পড়েছিল বলে মনে করা হয়। মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের ধাক্কায় রামায়ণ আর শিক্ষিত সমাজে স্থায়ী থাকেনি, তা ধনী-দরিদ্র, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে লোকায়ত জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আসলে বাঙালি জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এই রামায়ণ। এতেই বাংলার তৎকালীন লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল। কারণ রামায়ণ গেয়কাব্য বলেই পাঁচালি আকারে পূর্বে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আসরে পরিবেশিত হত। তাই রামায়ণ গান পরিবেশনের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের যোগ এখনও রয়ে গেছে।[২৮] এমনকি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেও "মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী, ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোটবড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেবমন্দিরে।"[২৯] সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রামায়ণ পাঁচালি আকারে কতকটা কথকতার মতো লোকসমাজে স্থান করে নিয়েছিল। পরবর্তীতে রামায়ণ থেকে খণ্ড খণ্ড কাহিনি নিয়ে নৃত্য-গীত সহকারে অভিনীত হত। ধীরে ধীরে তার মধ্যে সংলাপ যুক্ত হয়ে লোকনাট্যে পরিণত হয়। তবে এই অঞ্চলের শুরুতে কুশান গানে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব ছিল না। কোচবিহারের রাজসভায় অনুদিত রামায়ণ এবং লোকায়ত জীবনে প্রচলিত রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছিল কুশান লোকনাট্য। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, "...আখ্যানরসের দিক থেকে মধ্যযুগ থেকেই, বাঙালী রামায়ণকেই বেশী পছন্দ করে এসেছে। সে মধ্যযুগীয় কারণ তো আছেই, উপরন্তু আলোচ্য অঞ্চলের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কারণও এর পেছনে কাজ করছে বলে অনুমান হয়। রামায়ণ সম্পর্কে শঙ্করদেবের ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এও লক্ষ্যণীয়, আসামে 'অঙ্কীয়া নাটে'র মাধ্যমে রাম-রামায়ণের যে প্রভাব ও ব্যাপকতার সৃষ্টি তিনি করতে পেরেছিলেন, কোচরাজদরবার ছাপিয়ে সাধারণ লোকজীবনে তিনি কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।"[৩০] তবে পরের দিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা কুশান লোকনাট্য

স্থান করে নেয়। সুতরাং কুশান পালার উদ্ভব আমরা এভাবে দেখাতে পারি—

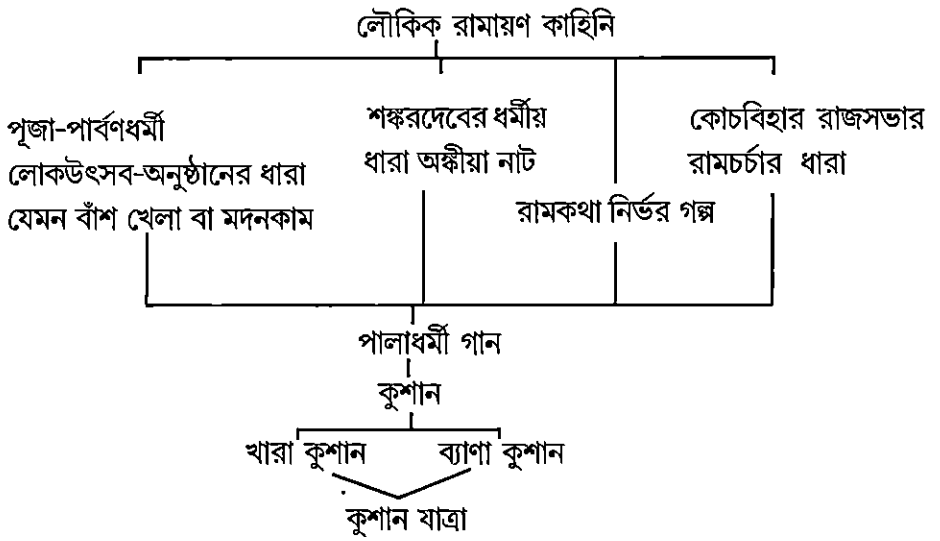

কুশান লোকনাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পয়ার ও সংলাপের মাঝে ফ্যাসা ও খোসার ব্যবহার। ফ্যাসা হল একধরণের খণ্ড কাহিনি। আর খোসা হল খণ্ড কথা বা গান। পৌরাণিক লোকনাটকগুলির মতো কুশানেও Dramatic relief দেবার জন্যই এই ধরণের ফ্যাসা বা খোসা গান ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে যে খণ্ড খণ্ড কাহিনি পাওয়া যায় তা সমসাময়িক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করে। এগুলির উপর ভিত্তি করেই পালাগুলির প্রাচীনত্ব বিচার করা যায়। তাই কুশান গানের ক্ষেত্রে এই খোসা বা ফ্যাসাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কুশান লোকনাটক কাহিনির দিক থেকে তেমন পরিবর্তন না হলেও এই ধরণের খোসা বা ফ্যাসা গানগুলি সর্বত্রই পরিবর্তিত হয়। সংকলিত পালাগুলি আলোচনার মাধ্যমে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরা হবে।

কুশান লোকনাটকের 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' পালাটিতে কাহিনির দিক থেকে রামায়ণকে অনুসরণ করা হয়েছে। গঠনগত দিক থেকে দেখা যায় পয়ার রীতির ব্যবহার। মূল ও দোয়ারী মিলেই এই পালা পরিবেশন করেন। পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপ স্খালনের জন্য রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, লব-কুশ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বন্দী, লব-কুশের সঙ্গে যুদ্ধ, যুদ্ধে রামসহ চার ভাই-এর মৃত্যুবরণ, হনুমানের বন্দীদশা, রাম সহ সকলের পুনর্জীবন, সীতা ও লব-কুশকে ফিরে পাওয়া— এই নিয়ে এই পালার কাহিনি। যেমন—

"দেখ দেখিহে খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে।।
খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে রে।
বাজিয়া গেল রণ ঃ আরে।
ওকি দেখহে প্রথমেতে করে যুদ্ধ মুখে গালাগালি।

ওকি দেখহে দ্বিতীয়তে করে যুদ্ধ বাহু ঠেলাঠেলি।

ওকি দেখ হে তৃতীয়াতে করে যুদ্ধ বাণ বরিলন।

ওকি দেখহে পৃথিবীতে মহাশব্দ বানের গর্জন।।

ওকি দেখহে কুশের প্রধান বান বেড়াপাক নাম।

ওকি দেখহে সেই বান ধনুকেতে করিল সন্ধান।।

ওকি দেখহে মুহাপাশ বাণ তখন লবের মনে পড়ে।

সন্ধান করিয়া বাণ ধনুকেতে জুড়ে।।

ওকি দেখহে মুহাপাশ বান যেন যায় নানা ছন্দে।

ওকি দেখহে হস্তে গলে শত্রুঘ্নের অবশেষে বান্দে।।"

(কুশান — অশ্বমেধ যজ্ঞ)

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালায় পয়ার রীতি ব্যবহার করার পাশাপাশি এতে সংলাপের প্রবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন চরিত্রের আগমন হয়েছে। মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদে রাবণের হাহাকার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাবণের যুদ্ধযাত্রা, শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীর খোঁজ, বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরোগন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসা, লক্ষ্মণের জীবন লাভ পর্যন্ত এর কাহিনির বিস্তার। যেমন—

"রাম ঃ ওহে মিত্র বিভীষণ!

এই ধনুর্বাণ তোমার করে করিনু অর্পণ।

ওরে তোরা সবাই মিলে জয়ধ্বনি দাও।

[রাম শেল উপড়িয়া লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলো]

ওরে অনুজ লক্ষ্মণ! একবার তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

গীত/৪

ও-ও-মোর গুণের ভাইরে, ভাই লক্ষ্মণরে!

কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।

মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।।

এনেছি সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের নিধি।

আসিয়া সাগর পারে বাম হইল বিধি।।

কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস।

সীতা উদ্ধারিতে আজি হইল সর্বনাশ।।

এনেছি সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের ধন।

কি বলিয়া নিবারিব মায়ের ক্রন্দন।।

পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।

বিধি বাদী হইল এই তাহে সর্বনাশ।।" (কুশান— লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

'দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র' পালায় রামায়ণের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে খোসা গান ও ফ্যাসা ব্যবহার করা হয়েছে। পালাটিতে ইন্দ্রের রাজসভায় তালভঙ্গের অপরাধে নর্তকীদের ইন্দ্রের অভিশাপ, নর্তকীদের বিশ্বামিত্রের তপোবনে প্রবেশ ও লতাপাশে বন্দী, বন্দিনী নর্তকীদের মুক্ত করে হরিশ্চন্দ্রের উপর বিশ্বামিত্রের ক্রোধ, অযোধ্যাসহ সসাগরা পৃথিবী দান, দানের দক্ষিণা মেটাতে ভার্যাসহ নিজেকে বিক্রয়, পুত্র রুহিদাসকে সর্পদংশন, হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে শৈব্যার শ্মশানে মিলন-এই কাহিনির বিষয়বস্তুকেই নেওয়া হয়েছে।

এই পালাটির মধ্যে একটি ফ্যাসা বা উপকাহিনিও গড়ে উঠেছে। দুই ভাই ব্যাঘারু ও শ্যাকারু ঝগড়াঝাটি করে জোতদারের মধ্যস্থতায় আলাদা হয়। দুই ভাই-এর সম্পত্তি বলতে ছিল একটি সুপারি গাছ, একটি গাই আর এটি কাঁথা। এগুলিকে দুই ভাগ করে নিতে গেলে মহাসমস্যা বাধে। শ্যাকারু ব্যাঘারুর তুলনায় চালাক হওয়াতে সে আগেভাগে সুপারি গাছের উপরের অংশ, গরুর পেছন ভাগ ও কাঁথাটি রাতে নেওয়ার কথা জানায়।

"মূল ঃ হ্যা ঐ গছটার দুইভাগ, গাইটার দুইভাগ, আর ঐ পুরান দাগিলাখান তো ভাগ করা না যায়, ছিড়িলে তোমরা কায়োয় পিন্দিবার পাবেন না। তায় দাগিলাখানক এবেলা ওবেলা করি তোমরা দোনোজনে পিন্দিবার পান।

ছুকরী ঃ মুই তায় গছটার আগিলাখান, গাইটার পাছিলাখান আর দাগিলাখান রাতিত নিম।

মূল ঃ কি ব্যাঘারু, তুই কি রাজি আছিস।

দোয়ারী ঃ হ্যা দেউনিয়া, ও হোবে ভালা।

মূল ঃ ঠিক আছে তায় ঐটায় কাথা রইল।" (সকলের প্রস্থান)"

(কুশান— দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র)

বোকা ব্যাঘারু এই তিনটি জিনিসের কোনটিও ভোগ করতে পারে না। শেষে প্রতিবেশীদের বুদ্ধিতে সে শ্যাকারুকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়। বেগতিক দেখে শ্যাকারু আবার জোতদারের শরণাপন্ন হয়।

"ছুকরী ঃ দেউনিয়া মোর দাদা আজি আমার গুয়ার গছটা কাটির ধরিচে।গাইটাক কালি থাকি কোনোয় খোয়ায় নাই। আজি আরো মোর ভাগের দাগিলাখান ভিজি থুইছে। আরো কইলে কয় মোর ভাগেরখান মুই কি করিম না করিম তোক কি পুছিয়া করিম। তোমরায় এলা বিচার করেন।

মূল ঃ হয় নাকি ব্যাঘারু। কাথাটা সচায়।

দোয়ারী ঃ হু দেউনিয়া, কাথাটা সচায়।

মূল ঃ দ্যাখেক শ্যাকারু মোর তো এইটে কিছু কওয়ার নাই। তোমরায় এইঢক করি জিনিসলা ভাগ করি নিছেন। এলা এইলা তোমরাই বোঝেন। মুই গেনু। (প্রস্থান)

ছুকরী ঃ দা, মোর ভুল হয়া গেইচে। মোক মাপ করি দে।

দোয়ারী ঃ শ্যাকারুরে মোর ভাই, তোক মুই মাপ না করে রবার পাম।"

কিন্তু জোতদার আর সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হওয়ায় শ্যাকারু তার ভুল বুঝতে পারে এবং দাদার কাছে ক্ষমা চায়। এই উপকাহিনির মধ্য থেকে তৎকালীন সামাজের বিচার ব্যবস্থা জোতদারের মত সম্পন্ন লোকেদের হাতে ন্যাস্ত ছিল তা জানা যায়।

'হরিশ্চন্দ্রের দান' পালাটির বিষয়বস্তু একই হলেও এর মধ্যে রয়েছে খোসা গানের ব্যবহার।

"মূল ঃ স্ত্রী লইয়া যায় রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কে কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে।।
এক বিপ্র ছিল হাটে পণ্ডিত সুজন।
তার একটি দাসীর ছিল প্রয়োজন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মাইয়াক বেচি চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা পালুং।
মুনিবর তোমরা এইলা গ্রহণ করেন।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা, চাইর কোটি তো দিলু। আরো তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা যে বাকি আছে।

খোসা ঃ ও মোর কালারে কালা
ও পারে কালা বান্দিলুং বাড়ি
কলা গাড়িলুং কালা সারি সারি
কলা বাগিচায় ঘিরিয়া নিল মোর বাড়ি।
আগদুয়ারী কালা কুকুর ভোকে
মন কয় মোর যেন বন্ধু আইসে
দেখং বন্ধু মোর কার বা বাড়িত বইসে।
ও মোর কালারে কালা
সেদিন যাইম মুই বাপের বাড়ি
মইষা গাড়ি কিংবা গরুর গাড়ি
ভাই বোন মোর কান্দি রবে মোর সারি সারি
কুনদিন ফিরিয়া আসিম বা মুই বাপের বাড়ি
ও মোর কালারে কালা।" (কুশান— হরিশ্চন্দ্রের দান)

এই খোসা গানটিতে রয়েছে প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষা। নদীর ওপারে বাড়ি তৈরি করে আশায় আশায় দিন কাটাচ্ছে। বাড়ির চারিদিকে সারি সারি কলাগাছ গাড়ার ফলে কলার বাগানে ঘিরে নিয়েছে তার বাড়ি। বাড়ির সামনে কুকুরের অচেনা কাউকে দেখলে ডেকে ওঠা বারবারই তার প্রিয়তমের আগমনের উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তোলে। এর মধ্য থেকে যেন গ্রাম-বাংলারই ছবি ফুটে উঠেছে। গরু বা মোষের গাড়িতে যেদিন সে বাপের বাড়িতে যাবে আনন্দে মন ভরে উঠবে। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় ভাই-বোনেরা তাকে চোখের জলে বিদায় দেবে। আবার কখনও দেখা যায়—

"খোসা ঃ বাপ কি এবার মঙ্গা গেল রে
আশ্বিন কার্তিক মাস
চোতুর্দিকে হাহাকার ঘরে ঘরে উপাস।
আইলের কচু খুড়িয়া খাইলেক কলার মুড়ার উষা
ভাইরে এইবার মরণ দোশা।
প্যাটের ভোকে বুড়ি সরি রে, হইলো সর্বনাশ ভাইরে
বাপ কি এইবার মঙ্গা গেল রে।" (কুশান — হরিশ্চন্দ্রের দান)

এই খোসা গানটিতে সেই বছরের মন্দার রূপটি উঠে এসেছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ভালো না হওয়ায় চারিদিকে অন্নের হাহাকার। ঘরে ঘরে সবাই উপোস দিয়ে রয়েছে। পেটের খিদে মেটাতে গ্রামের প্রায় সবাই ক্ষেতের আলের ধারের কচু ও কলাগাছের মুড়ো খুড়ে এনে সিদ্ধ করে খেয়েছে।

'হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার শ্মশানমিলন' পালায় কাহিনির পাশাপাশি ব্যবহৃত খোসা গানটিতে নববিবাহিত দম্পতির একে অপরকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়। সেই অবস্থায় দাদা এসেছে তার বোনকে দু'চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে। মন না চাইলেও তাকে যেতে হয়। সেজেগুজে দাদার সঙ্গে যাবার সময় বারবার পিছু ফিরে চায়। পান-সুপারির পোটলা বিছানায় ফেলে এসেছে বলে দাদাকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে বাড়িতে এসে স্বামীকে প্রবোধ দেয়।

" শৈব্যা ঃ কিন্তু এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াব প্রভু।
হরিশ্চন্দ্র ঃ তুমি, আমি, পুত্র রুহিদাস।
তিনজন করিতে হইবে কাশিবাস।।
চল, শৈব্যা আর দেরি নয় এই মুহূর্তে আমরা রওনা দেই। (রওনা দিল)
খোসা ঃ দিন চারিক প্রাণপতিধন ভাত রান্ধিয়া খান
দাদা আসছে নাইয়োর নিবার নাইয়োর যাবার চাং

বহুদিনে আসছে দাদা যদি বা না যাং গোসা হয়য়া
যাবে দাদা কাথাটা কেমন করিয়া কং। (দুইবার)
গ্যাল্লেস করি আধ বোতল তেল মাথাত দিলুং ঢালি
আয়না দেখি সিতা পারিলুং খোপা বান্ধিলুং তুলি।
স্নো পাউডার দিলুং কত মুখোত লাগাইয়া
কাম সিন্দুরের ফোটা দিলুং কপালোত ন্যালভ্যাল করিয়া।
গোড়া ঐ দিন চারিক .....কেমন করিয়া কং
হাটিও যাং ফিরিও চাং পাচ ফিরি দ্যাখোং
মাথার ঘোমটা ফেলেয়া দাদাক ইশারা করি কং
বাড়ি হইতে আইসোং দাদা হাটেক ধীরে ধীরে
গুয়াপানের টোপলাখুনা ছাড়িচুং বিছানার উপরে।
গোড়া ঐ দিন চারিক .....যাবার চাং
আধ ঘাটাত খুইয়া দাদাক দৌড়ি গেলুং বাড়ি
বাড়ি যায়া দ্যাখোং স্বামীধন বিছানাত আছে পড়ি।
বগোলত বসিয়া এলা কং ধীরে ধীরে
দুই-চারদিন ও স্বামীধন থাকেন বোল কোনরকমে
গোড়া ঐ দিন চারিক .....কেমন করিয়া কং।''

(কুশান— হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার শ্মশান মিলন)

সুতরাং বলা যেতে পারে, লোকনাটকগুলির কাহিনির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু বিবর্তন ঘটে চলেছে। এর পেছনে কারণ মূলত সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন। উৎস থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে লোকনাটকগুলির কাহিনির রূপান্তর ঘটে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা ও সংগ্রহ, পৃ.৭-৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. তিন।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

৪. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা ও সংগ্রহ, পৃ. ২।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, পৃ. ১০০।

৬. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পৃ. ২২৫।

৭. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা ও সংগ্রহ, পৃ. ৯।

৮. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ১৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১০. ড. ফণী পাল, গম্ভীরার কবি-শিল্পীদের জীবন-কথা ও সংগীত সংগ্রহ, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

১২. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ২৯।

১৩. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ১২।

১৪. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ৩০।

১৫. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২০।

১৬. আর্য্য চৌধুরী, প্রসঙ্গ ঃ 'প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গম্ভীরা গান'।। একটি সংযোজন, লোকশ্রুতি, Vol.5, Issue 2, পৃ. ১২৩।

১৭. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, পৃ. ৬৮।

১৮. আর্য্য চৌধুরী, প্রসঙ্গ ঃ 'প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গম্ভীরা গান'।। একটি সংযোজন, লোকশ্রুতি, Vol.5, Issue 2, পৃ. ১২৪।

১৯. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা ঃ পুনর্বিচার, পৃ. ৯৮।

২০. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, পৃ.১৭৮।

২১. ধনঞ্জয় রায়, খন, পৃ.১৩।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৩. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৯৬।

২৪. সাক্ষাৎকার ঃ খুশী সরকার (৫২), উষাহরণ রোড, কুশমণ্ডী, দক্ষিণ দিনাজপুর, তাং ০৩.০৪.২০১০।

২৫. সাক্ষাৎকার ঃ দীনেশ রায় (৬২), রাউতপল্লী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং- ১২.০৯.২০০৯।

২৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

২৭. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সংগ্রহ, পৃ. ১৩১-১৩২।

২৮. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৮।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৩০. জগন্নাথ ঘোষ, সম্পাদক, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ. ২৪।